ইস্টিশন

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩

ইস্টিশন
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

গ্রন্থস্বত্ব : প্রফেসর ইয়াসমীন হক

তাম্রলিপি-২০৯

পরিচালক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম
তাম্রলিপি
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সৃজনী
৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০.০০

STATION
By : Muhammed Zafar Iqbal
First Published : February 2013, by A K M Tariqul Islam
Director : Tasnova Adiba Shanjuti, Tamralipi, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 200.00 US $: 10

ISBN : 984-70096-0219-1

উৎসর্গ

প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী মূসা ইব্রাহীম
দুইবার এভারেস্ট বিজয়ী এম.এ. মুহিত
প্রথম মহিলা এভারেস্ট বিজয়ী নিশাত মজুমদার
এভারেস্ট এবং এন্টার্টিকার সর্বোচ্চ পর্বত বিজয়ী ওয়াসফিয়া নাজরীন

যারা আমাদের ছেলেমেয়েদের
দুঃসাহসী হতে শিখিয়েছে এবং দেশকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে।

১.

মায়া চিৎকার করে বলল, "টেরেন আহে। টেরেন!"

মায়ার সামনের দাঁতগুলো পড়ে গিয়েছে তাই কথা বলার সময় তার দাঁতের ফাঁক দিয়ে বাতাস বের হয়ে শব্দগুলোকে অন্যরকম শোনা যায়। সে আসলে বলার চেষ্টা করেছে "ট্রেন আসছে—ট্রেন!" মায়া শুধু যে ট্রেনকে টেরেন বলে তা নয়—সে গ্রামকে বলে গেরাম, ড্রামকে বলে ডেরাম! তাকে কেউ অবশ্যি সেটা শুদ্ধ করে দেবার চেষ্টা করে না, কারণ রেলস্টেশনে সে অন্য যে কয়জন বাচ্চা কাচ্চার সাথে থাকে তারাও ট্রেন আর টেরেন কিংবা ড্রাম আর ডেরামের মাঝে পার্থক্যটা ভালো করে ধরতেও পারে না, বলতেও পারে না।

মায়ার চিৎকার শুনে জালাল আর তার সাথে সাথে অন্যেরাও মাথা ঘুরিয়ে রেল লাইনের দিকে তাকাল, দূরে ট্রেনটাকে দেখা যাচ্ছে—আন্তঃনগর জয়ন্তিকা। পাকা দেড়ঘন্টা লেট।

জালালের হাতে একটা তরমুজের টুকরা, তার মাঝে যেটুকু খাওয়া সম্ভব সেটুকু সে অনেক আগেই খেয়ে ফেলেছে তারপরেও সে অন্যমনস্কভাবে টুকরাটাকে কামড়া কামড়ি করছিল। তরমুজটা এনেছে মজিদ, ফ্রুট মার্কেটের পাশে দিয়ে আসার সময় প্রত্যেক দিনই সে কলাটা না হয় আপেলটা চুরি করে আনে। স্টেশনে এসে সে প্লাটফর্মের রেলিংয়ে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে সবাইকে দেখিয়ে তৃপ্তি করে খায়। আজকে সে কীভাবে জানি আস্ত একটা তরমুজ নিয়ে এসেছে। কলাটা কিংবা আপেলটা চুরি করে আনা সম্ভব, তাই বলে আস্ত একটা তরমুজ? কীভাবে এতো বড় একটা তরমুজ চুরি করে এনেছে মজিদকে সেটা জিজ্ঞেস করে অবশ্যি কোনো লাভ হলো না, সে কিছুই বলতে রাজি হল না। আস্ত একটা তরমুজ মজিদের একার পক্ষে খেয়ে শেষ করা সম্ভব না তাই সে আজকে অন্যদেরও ভাগ দিয়েছে। তরমুজটা ভাগাভাগি করার সময় অবশ্যি মায়া কিংবা মতির মতো ছোট বাচ্চাগুলো বেশি সুবিধে করতে পারেনি।

জালাল, জেবা আর শাহজাহানের মতো একটু বড়রাই তরমুজটা কাড়াকাড়ি করে নিয়েছে।

ট্রেনটা আরো কাছে চলে এসেছে, রেল লাইনে হালকা একটা কাঁপুনি টের পাওয়া যাচ্ছে। জালাল তার হাতের তরমুজের টুকরাটা রেললাইনে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ওঠে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ সবাই একসাথে হই হই করে ট্রেনের দিকে ছুটতে শুরু করে। জালাল কিংবা মায়ার মতো যারা স্টেশনেই থাকে তাদের কাছে ট্রেনটাই হচ্ছে বেঁচে থাকার উপায়। এই ট্রেনের ওপরেই তাদের থাকা খাওয়া সবকিছু নির্ভর করে। ট্রেনে যে যত আগে উঠতে পারবে কিছু একটা আয় রোজগার করার সম্ভাবনা তার তত বেড়ে যাবে, তাই সবাই ট্রেন থামার আগেই লাফিয়ে সেটাতে ওঠার চেষ্টা করে। সবার আগে জালাল বিপজ্জনক ভাবে লাফ দিয়ে ট্রেনের একটা বগিতে ওঠে গেল। প্রায় সাথে সাথে জেবা, মজিদ, শাহজাহানও লাফিয়ে একেকজন একেকটা বগিতে ওঠে পড়ল। মায়া কিংবা মতির মতো যারা ছোট, যারা এখনো লাফিয়ে চলন্ত ট্রেনে ওঠা শিখেনি তারা ট্রেনটার পাশাপাশি ছুটতে থাকে—ট্রেনটা থামলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা ট্রেনে উঠবে।

ট্রেনের বগিতে ওঠেই জালাল সতর্ক চোখে প্যাসেঞ্জারদের লক্ষ করে। ট্রেন দেড়ঘণ্টা লেট করে এসেছে তাই প্যাসেঞ্জারদের পেটে খিদে, সবাই কম-বেশি ক্লান্ত, সবারই মেজাজ কম-বেশি খারাপ। এর মাঝে জালালের মতো রাস্তার একটা বাচ্চাকে ট্রেনের মাঝে ছোটাছুটি করতে দেখে তাদের মেজাজ আরো গরম হয়ে উঠতে লাগল। জালালের মতোই অন্যেরাও ট্রেনের বগিতে ছোটাছুটি করে সিটের উপরে, সিটের নিচে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে যায়। খালি পানির বোতল, ফেলে যাওয়া চিপসের প্যাকেট, খবরের কাগজ, আধ খাওয়া আপেল কুড়াতে কুড়াতে তারা ছুটতে থাকে। তাদের ছোট ছোট নোংরা শরীরে ধাক্কা খেয়ে প্যাসেঞ্জাররা খুবই বিরক্ত হয়, দুই একজন মুখ খিঁচিয়ে তাদের গালাগালিও করে। বাচ্চাগুলো অবশ্যি সেই গালাগালকে কোনো পাত্তা দেয় না। তারা পথে ঘাটে গালাগাল চড় থাপড় খেয়ে বড় হয়েছে, মুখের গালাগাল তাদের জন্যে কোনো ব্যাপারই না। সত্যি কথা বলতে কী তারা এই গালাগাল ভালো করে শুনতেও পায় না।

জালাল প্যাসেঞ্জারদের চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে মাঝারি বয়সের একজনকে বের করল, মানুষটা ব্যাগ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন থেমে যাবার সাথে সাথে নেমে যাবার জন্যে ব্যস্ত। চেহারা দেখে মেনে হয় মানুষটার

মাঝে একটু দয়া মায়া আছে। জালাল কাছে গিয়ে মাথাটা বাঁকা করে নিজের চেহারার মাঝে একটা দুঃখি দুঃখি ভাব ফুটিয়ে নিয়ে নিচু গলায় বলল, "স্যার! ব্যাগটা নিয়া দেই?"

মানুষটা মুখ শক্ত করে বলল, "লাগবে না। যা—ভাগ।"

জালাল তার চেহারায় আরো কাচুমাচু ভাব নিয়ে আসে, "স্যার, একটু ভাত খাইতাম। কিছু খাই নাই। পেটে ভুখ।"

কথাটা সত্যি না, আজকে দুপুরে সে ঠেসে খেয়েছে। স্টেশনের পাশে জালালীয়া হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট। সকালবেলা সেখানে যখন মুরগি জবাই করছে তখন একটা মুরগি কেমন করে জানি ছুটে গেল। কঁক কঁক করে ডাকতে ডাকতে সেটা নালার উপর দিয়ে দৌড়াতে লাগল। শুধু তাই না মুরগি হওয়ার পরও পাখির মতো ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে সেটা রেলওয়ে গেস্ট হাউজের দেওয়ালের উপর ওঠে গেল। জালাল সেই দুর্ধর্ষ মুরগিটাকে ধরে এনে দিয়েছে। হোটেল ম্যানেজার সেজন্যে তাকে দুপুরবেলা এক পেট খেতে দিয়েছে। ভাত, বিফ ফ্রাই আর ডাল। হোটেলের রান্নাঘরের কাছে যেখানে মোটা মোটা মহিলারা বসে পেঁয়াজ কাটে সেখানে বসে সে অনেকদিন পর তৃপ্তি করে খেয়েছে—যতবার বলেছে "আরো ভাত" ততবার তাকে ভাত দিয়েছে, সাথে বিফ ফ্রাইয়ের ঝোল আর ডাল। তারপর স্টেশনে এসে মজিদের চুরি করে আনা তরমুজের বিশাল একটা টুকরা খেয়েছে। কাজেই পেটে আর যাই থাকুক খিদে নাই—কিন্তু এই কথাগুলো তো আর প্যাসেঞ্জারদের জানার দরকার নেই। জালাল মুখ আরো কাচুমাচু করে বলল, "ব্যাগটা নিয়া দেই? পেটে খিদা একটু ভাত খামু।"

মানুষটার নরম ধরনের মুখটা এক সেকেন্ডে কেমন যেন হিংস্র হয়ে যায়, জালালের দিকে তাকিয়ে খেকিয়ে উঠল, "ভাগ হারামজাদা। কথা কানে যায় না?"

জালাল মনে মনে বলল, "তুই হারামজাদা!" তারপর এই মানুষটার পিছনে আর সময় নষ্ট করল না। ভালো মানুষ ধরনের অন্য একজনের কাছে গিয়ে তার পেট মোটা ব্যাগটা ধরে বলল, "স্যার ব্যাগটা নামায়া দেই?"

মানুষটার চেহারাই শুধু ভালো মানুষের মতো—আসলে সে মহা বদ। সে জালালের দিকে তাকালই না, কথাটা শুনেছে সেরকম ভান পর্যন্ত করল না। কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাব করে দাঁড়িয়ে রইল। এই প্যাসেঞ্জারের পিছনে সময় নষ্ট করে লাভ নাই জানার পরও জালাল শেষ চেষ্টা করল, ডান হাতটা বুকের

কাছে আড়াআড়ি ভাবে ধরে মাথাটা একটুখানি বাঁকা করে মুখের মাঝে একটু দুঃখ দুঃখ ভাব ফুটিয়ে বলল, "স্যার! ব্যাগটা নামায়া দেই। পেটে ভুখ। একটু ভাত খামু।"

মানুষটা একটু হাই তুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল যেন জালাল আশেপাশে আছে, কিছু একটা বলছে সেটা সে লক্ষ পর্যন্ত করেনি। জালাল আর সময় নষ্ট করল না, মনে মনে মানুষটাকে একটা গালি দিয়ে সামনের দিকে দৌড়ে গেল।

ট্রেনটা এতোক্ষণে থেমে গেছে, সবাই ওঠে দাঁড়িয়ে উপর থেকে মালপত্র নামানো শুরু করেছে। বগির মাঝামাঝি একটা মেয়ে তার ব্যাগগুলো হাতে তোলার চেষ্টা করছে। জালাল কাছে গিয়ে বলল, "আফা আপনার ব্যাগটা নিয়া দেই?"

মেয়েটা ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি কেমন করে ব্যাগ নিবে? এতো ছোট মানুষ!"

মেয়েটার কথা, গলার স্বর, বলার ভঙ্গি শুনেই জালাল বুঝে গেল এই মেয়েটাকে সে নরম করে ফেলতে পারবে। হাতটা বুকের কাছে এনে মুখের মাঝে দুঃখি দুঃখি একটা ভাব ফুটিয়ে বলল, "সারাদিন কিছু খাই নাই আফা! পেটের মাঝে ভুখ—একটু ভাত খাবার চাচ্ছিলাম।"

মেয়েটা জালালের মুখের দিকে তাকায়, এটা খুবই ভালো লক্ষণ। যাদের মন নরম তারা মুখের দিকে তাকায়, চোখের দিকে তাকায়। যারা বদ টাইপের লোক তারা অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে—কথা না শোনার ভান করে। জালাল গলার স্বরটা আরো দুঃখি দুঃখি করে বলল, "দেন আফা! ব্যাগটা নিয়া দেই।"

"কত নেবে?"

আনন্দে জালালের বুকের মাঝে রক্ত ছলাৎ করে উঠল কিন্তু সে মুখে কিছুই বলল না। মুখটা আরা দুঃখী দুঃখী করে বলল, "আপনি যা দিবেন তাই—"

"উঁহু। কত দিতে হবে আগে থেকে বল।"

জালাল কোনো কথা না বলে টান দিয়ে একটা ব্যাগ মাথায় তুলে নিয়ে বলল, "আপনি খুশি হয়ে যা দিবেন তাই আফা!"

মেয়েটা হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করে বলল, "চল।"

জালালের মুখে হাসি ফুটে উঠল এবং এইবারে সে এটা লুকানোর চেষ্টা করল না। এই মেয়েটা এখন তাকে যতই দিতে চাইবে সে ভান করবে সেটা কম আর আরো বেশি দেওয়ায় জন্যে সে ঘ্যানঘ্যান করতে থাকবে। পৃথিবীতে

এই মেয়েটার মতো সহজ সরল দুই চারজন মানুষ আছে বলেই সে মাঝে মধ্যে দুই চারটা টাকা বেশি রোজগার করতে পারে।

ট্রেন থেকে নেমে ব্যাগটা মাথায় নিয়ে সে মেয়েটার সামনে সামনে হাঁটতে থাকে। চোখের কোনা দিয়ে তাকিয়ে দেখল মজিদ এখনো কারো ব্যাগ নিতে পারেনি, মুখ কাচুমাচু করে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে। গাধাটা ফার্স্ট ক্লাশে উঠেছিল! ফার্স্ট ক্লাশের প্যাসেঞ্জারদের ব্যাগ নেওয়ার জন্যে নিজেদের লোকজন থাকে। যদি নিজেদের লোকজন না থাকে তাহলে ব্যাগের নিচে চাকা লাগানো থাকে তারা সেই চাকা লাগানো ব্যাগ টেনে টেনে নিয়ে যায়। গরিব মানুষের পেটের ভাত মারার জন্যে কত রকম কায়দা কানুন সেটা দেখে জালাল মাঝে মাঝে তাজ্জব হয়ে যায়।

ব্যাগটা তুলে দেবার পর মেয়েটা তাকে পাঁচ টাকার একটা নোট দিল। হালকা একটা ব্যাগ যেটা মেয়েটা নিজেই নিয়ে আসতে পারত তার জন্যে পাঁচ টাকার বেশি দেওয়ার কথা না। কিন্তু জালাল হতভম্ব হয়ে যাবার একটা ভঙ্গি করল। মুখের এমন একটা ভঙ্গি করল যেন মেয়েটা তার মুখে একটা চড় দিয়ে ফেলেছে। চোখ কপালে তুলে বলল, "এইটা কী দিলেন আফা?"

"কেন কী হয়েছে?" মেয়েটা ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি না বললে আমি খুশি হয়ে যা দিতে চাই দিব।"

"তাই বইলা এতো কম?"

"আমি বলেছিলাম আগে থেকে বল—"

"আপনার সাথে আমি দরদাম করমু? ভাত খাওয়ার জন্য একটু টাকা দিবেন না?"

"যাও-যাও বিরক্ত করো না! এইটুকুন একটা ব্যাগের জন্যে পাঁচ টাকাই বেশি। টাকা গাছে ধরে না।"

জালাল চোখে মুখে একটা আহত ভাব ফুটিয়ে বলল, "আফা—আজকাল পাঁচ টাকা কেউ ফকিরকেও ভিক্ষা দেয় না। আমি কি ফকির?"

মেয়েটা অসম্ভব বিরক্ত হয়ে জালালের দিকে তাকাল। জালাল পাঁচ টাকার নোটটা মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "আফা, আপনার টাকা আমার লাগত না। নেন—"

মেয়েটা মনে হয় নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে জালালের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ব্যাগ থেকে আরো একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে জালালের দিকে প্রায় ছুড়ে দিয়ে স্কুটারে ঢুকে গেল।

স্কুটারটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত মুখে একটা আহত ভাব ফুটিয়ে জালাল দাঁড়িয়ে রইল। স্কুটারটা চলে যাবার পর সে নোট দুইটাতে চুমু খেয়ে তার বুক পকেটে রেখে দেয়। আজকের দিনটা এখন পর্যন্ত মোটামুটি ভালোই যাচ্ছে—সারাটা দিন এইভাবে গেলে খারাপ হয় না।

প্যাসেঞ্জাররা চলে যাবার পর প্লাটফর্মটা একটু ফাঁকা হলো। তবে স্টেশনের মজা হচ্ছে এটা কখনোই পুরোপুরি ফাঁকা হয় না। একটা ট্রেন যখন আসে কিংবা ছাড়ে তখন হঠাৎ করে স্টেশনে অনেক মানুষের ভিড় হয়ে যায়। ট্রেনটা চলে যাবার পর ভিড় কমে গেলেও অনেক মানুষ থাকে। পত্রিকার হকার, ঝালমুড়িওয়ালা, অন্ধ ফকির, দুই চারজন পাগল, স্টেশনের লোকজন, কাজকর্ম নেই এরকম পাবলিক। এই মানুষগুলোর মাঝে অবশ্যি প্যাসেঞ্জারদের ছটফটানি ভাবটা থাকে না। তারা শান্তভাবে এখানে সেখানে বসে থাকে না হয় হাঁটাহাঁটি করে।

জালাল পকেটে চকচকে দুইটা নোট নিয়ে প্লাটফর্মে ঢুকল। গেটের কাছে হঠাৎ একটা মানুষ তাকে থামাল, "এই পিচ্চি—এইখানে বাথরুম কোনদিকে?"

মানুষটার মুখ দেখে মনে হচ্ছে অবস্থা বেশি ভালো না—এখনই বাথরুমে না গেলে ঝামেলা হয়ে যাবে। দোতালায় ভদ্রলোকদের বাথরুম, নিচে ডান দিকে পুরুষদের, বাম দিকে মেয়েদের, সোজা সামনে গেলে গরিব মানুষের ময়লা বাথরুম। জালাল তার কোনোটা না দেখিয়ে একেবারে উল্টো দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "হুই যে হেই দিকে।"

মানুষটা জালালের কথা বিশ্বাস করে লম্বা লম্বা পা ফেলে সেদিকে হাঁটতে থাকে। জালাল দাঁত বের করে হাসতে হাসতে তাকিয়ে দেখে মানুষটা এখন প্রায় দৌড়াচ্ছে। কোনো বাথরুম খুঁজে না পেয়ে তার কী অবস্থা হবে চিন্তা করে তার মুখের হাসিটা প্রায় দুই কান ছুয়ে ফেলল।

জালাল প্লাটফর্মে ঢুকে এদিক সেদিক তাকিয়ে অন্যদের একটু খোঁজ নিল। তারপর এক কোণায় জড়ো করে রাখা অনেকগুলো বড় বড় বস্তার একটার উপর হেলান দিয়ে বসল। বস্তার মাঝে কী আছে কে জানে, আশেপাশে একটু বোকটা গন্ধ, কিছুক্ষণের মাঝেই অবশ্যি জালাল গন্ধটার কথা ভুলে গেল। জালালকে দেখে একটু পর অন্য বাচ্চাগুলোও আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে যায়। এই ট্রেনটা থেকে কার কী আয়-রোজগার হয়েছে সেটা নিয়ে নিজেরা একটু কথাবার্তা বলল। মায়া তার হাতে মুঠি করে রাখা ময়লা নোটগুলি মনোযোগ দিয়ে দেখে, সে এখনো গুনতে শিখে নাই তাই দেখে একটা আন্দাজ করতে হয়। জালাল জিজ্ঞেস করল, "কয় টাকা পাইলি?"

"জানি না।"

"আমারে দে, গুইনা দেই।"

মায়া মুখ বাঁকা করে বলল, "ইহ!" তার এই মূল্যবান রোজগার আর কারো হাতে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।

জালাল সরল মুখ করে বলল, "আমি নিমু না। আল্লার কসম খোদার কীরা।"

মায়া ভুরু কুঁচকে তাকাল, জালাল সত্যি সত্যি বলছে না কী তার কোনো বদ মতলব আছে বুঝতে পারছে না।

মজিদ বলল, "দিস না মায়া। জালাল তোর টেহা গাপ কইরা দিব।"

জালাল বলল, "গাপ করুম না। খোদার কসম।"

মায়া তার পরেও জালালকে বিশ্বাস করল না, নিজেই টাকাগুলো গোনার চেষ্টা করতে লাগল। সে সব নোট চিনে না কিন্তু প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে ভিক্ষে করে সে এক দুই টাকার নোট আর খুচরা পয়সা ছাড়া কিছু পায় না, তাই গোনার বিশেষ কিছু থাকেও না।

মায়া তার ফোকলা দাঁত দিয়ে বাতাস বের করে বলল, "কেউ টেহা দিবার চায় না।"

মজিদ বলল, "কেন তোরে দিব? হেরা কি তোর জন্যি টেহা কামাই করে?"

জালাল মায়াকে উপদেশ দিল, "যখন টাকা চাইবি তখন হাসবি না। মুখটা কান্দা কান্দা করে রাখবি।"

মায়া বলল, "রাখি তো।"

"গায়ে হাত দিবি। পা ধরে রাখবি।"

"রাখি তো।"

"যতক্ষণ টাকা না দেয় ছাড়বি না।"

"ছাড়ি না তো।"

মজিদ বস্তায় শুয়েছিল হঠাৎ সোজা হয়ে বসে দুই নম্বর প্লাটফর্মের দিকে তাকিয়ে, চিৎকার করে ডাকল, "কাউলা। হেই কাউলা।"

সবাই দুই নম্বর প্লাটফর্মের দিকে তাকায়, সেখানে তিন চার বছরের একটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে—তার গায়ে কোনো কাপড় নেই। কখনো থাকে না। কাউলা তার নাম নয়, সত্যি কথা বলতে কী তার আসলে কোনো নাম নেই, গায়ের রং কুচকুচে কালো বলে তাকে কাউলা বলে ডাকে। জেবার ধারণা

কাউলার গায়ের রং আসলে কালো নয়—শরীরে ময়লা জমতে জমতে তার গায়ের রং এরকম কুচকুচে কালো হয়েছে!

মজিদ আবার চিৎকার করে বলল, "হেই কাউলা! তোর মা কই?"

অন্যেরাও তার সাথে যোগ দিল, "তোর মা কই? মা কই?"

কাউলা তাদের কথা বুঝতে পারল কীনা বোঝা গেল না। তাকে কেউ কথা বলতে শুনেনি, সে কথা বলতে পারে কীনা সেটাও কেউ জানে না। কেউ কিছু বললে সে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। এবারেও সে দুই নম্বর প্লাটফর্ম থেকে তাদের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল।

জেবা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, "তোর পাগলি মা কই?"

কথা শেষ হবার আগেই কাউলার মা'কে দেখা গেল। শুকনো খিটখিটে একজন মহিলা দেখে বয়স আন্দাজ করা যায় না। রুক্ষ মাথার চুলে জটা, শরীরে ময়লা কাপড়। মাথায় নিশ্চয়ই উকুন কিলবিল কিলবিল করছে, এক হাতে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বিড়বিড় করে কথা বলতে বলতে হাঁটছে।

মজিদ চিৎকার করে ডাকল, "পাগলি! এই পাগলি।"

মহিলাটা তাদের চিৎকারে কান দিল না, বিড়বিড় করে নিজের সাথে কথা বলতে বলতে হেঁটে যেতে থাকে।

শাহজাহান গলা উচিয়ে বলল, "এই পাগলি! তোর পাগলা কই?"

শাহজাহানের কথায় সবাই মজা পেয়ে গেল, তখন সবাই গলা উচিয়ে বলতে লাগল, "এই পাগলি! তোর পাগলা কই?"

মহিলাটা হঠাৎ দুই হাত ঝাকাতে ঝাকাতে মাথা নাড়তে থাকে এবং সেটা দেখে সবাই হি হি করে হাসতে থাকে। পাগল মানুষের বিচিত্র কাজ দেখে তারা খুব মজা পায়।

মজাটাকে আরো বাড়ানোর জন্যে মজিদ বলল, "আয় ঢেলা মারি!"

মহিলাটি তখন অনেকদূর এগিয়ে গেছে, এখান থেকে ঢেলা মেরে তার গায়ে লাগাতে পারবে না। তাছাড়া আশেপাশে অন্য মানুষজন আছে তাদের গায়ে ঢেলা লাগলে তাদের খবর হয়ে যাবে তাই মজাটাকে আজকে আর বাড়ানো গেল না।

কাউলা এতোক্ষণ দুই নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ সে ছুটতে ছুটতে তার মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে তার মায়ের কাপড় ধরে ফেলল। তার মা অবশ্যি ভ্রূক্ষেপ করল না, বিড়বিড় করে কথা বলতে বলতে মাথা চুলকাতে চুলকাতে হাঁটতে থাকল।

এরকম সময় জেবা জালালকে বলল, "এই জংলা তোর দোস্ত আইছে!"

জেবার যখন ঠাট্টা তামাশা করার ইচ্ছা করে তখন সে জালালকে জংলা ডাকে। তার কথা শুনে সবাই খুব আনন্দ পেল, কারণ যাকে সে দোস্ত বলছে সেটি হচ্ছে একটি কুকুর। কুকুরটা স্টেশনের আশেপাশে থাকে তবে জালালের সাথে তার একটি অন্যরকম সম্পর্ক। সময় পেলেই সেটা জালালের পাশে ঘুরঘুর করে, তাকে দেখলেই লেজ নাড়ে, আহ্লাদ করে।

জালাল বস্তা থেকে নেমে কুকুরটার পাশে গিয়ে সেটাকে ধরে একটু আদর করল। এইটুকু আদরেই কুকুরটা একেবারে গলে গেল। মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে সেটি তার চার পা উপরে তুলে কুঁই কুঁই শব্দ করে সোহাগ করতে থাকে।

মজিদ হি হি করে হেসে বলল, "জংলার দোস্ত কুত্তা!"

কথাটাতে সবাই মজা পেল। হি হি করে হাসতে হাসতে সবাই বলতে লাগল, "জংলার দোস্ত কুত্তা! জংলার দোস্ত কুত্তা!"

জালাল তাদের কথায় কান দিল না, কুকুরটার পেটে হাত দিয়ে সেটাকে আদর করতে থাকে।

শাহজাহান বলল, "কুত্তারে হাত দিয়া ধরন ঠিক না।"

জেবা জানতে চাইল, "ক্যান? হাত দিয়া ধরলে কী অয়?"

"কুত্তা নাপাক। এরে ধরলে তুইও নাপাক হবি।"

জালাল মুখ ভেংচে বলল, "তরে কইছে। এই [illegible]ত্তা তোর থাইকা পরিষ্কার।"

সবাই তখন আবার হি হি করে হাসল, কারণ [illegible]ত্যি। তাদের জামা কাপড়, শরীর যথেষ্ট নোংরা, তাদের মাঝে শাহজাহান [illegible]র বাড়াবাড়ি নোংরা এবং তাদের সবার তুলনায় এই কুকুরটা রীতিমতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

জালাল আরো কিছুক্ষণ কুকুরটাকে আদর করে বলল, "আয় কুক্কু যাই।"

জেবা বলল, "কুক্কু?"

জালাল মাথা নাড়ল, "হ। আমি এইটার নাম দিছি কুক্কু।"

"কুক্কু কী জন্যি? ভালা কুনু নাম দিতি পারলি না?"

"আমারে দেখলেই মাটিত শুইয়া কু-কু করে। এই জন্যি এর নাম হইল কুক্কু।"

সবাই তখন কুকুরটাকে ডাকতে লাগল, "কুক্কু! এই কুক্কু!"

কুকুরটা মনে হয় এতে বেশ মজা পেল। সেটা লেজ নেড়ে মুখটা উঁচু করে ঘেউ ঘেউ করে দুইবার ডাকল, [illegible] বলছে, "থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।"

জালাল কুকুরটাকে ডাকল, বলল, "আয় কুক্কু যাই।"

মজিদ জানতে চাইল, "কই যাস?"

"টাউনে।"

"কী জন্যি?"

"পানির বুতল বেচমু।"

তারা সবাই ট্রেন থেকে প্লাস্টিকের খালি পানির বোতলগুলো খুঁজে খুঁজে এনে জমা করে রাখে। সেগুলো নানা জায়গায় বিক্রি করে। জালাল তার বোতলগুলো শহরে বিক্রি করতে যায়, তার একটা কারণ আছে। কারণটা গোপন তাই সেটা কেউ জানে না, জানানো নিষেধ।

জালাল তার পানির খালি বোতলগুলো একটা দোকানের পিছনে রাখে। সে দোকানদারের ফাইফরমাস খাটে তাই দোকানদার জালালকে বোতলগুলো এখানে রাখতে দেয়। জালাল হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে তার খালি বোতলগুলো বের করে সেগুলো ভালো করে লক্ষ করল। যেগুলো পুরোপুরি অক্ষত সেই বোতলগুলো আলাদা করে বড় একটা পলিথিনের ব্যাগে ভরে ঘাড়ে নিয়ে সে ওঠে দাঁড়ায়। কুক্কু গভীর মনোযোগ দিয়ে সবকিছু লক্ষ করছিল। দেখে মনে হয় সে বুঝি সবকিছু বুঝতে পারছে।

জালাল বলল, "আয় কুক্কু যাই।"

কুক্কু লেজ নেড়ে জালালের সাথে রওনা দিল।

কুক্কুকে নিয়ে শহরে যাওয়ার অবশ্যি একটা বড় সমস্যা আছে, পথে ঘাটে যত কুকুর আছে তার সবগুলোর সাথে সে ঝগড়া আর মারামারি করতে করতে যায়। কুকুরদের মনে হয় নিজেদের একটা এলাকা থাকে, সেই এলাকায় অন্য কুকুর এলে আর রক্ষা নেই, একটা ভয়ংকর মারামারি হবেই হবে। স্টেশনের এই পুরো এলাকাটা কুক্কুর দখলে, অন্য যে কুকুর আছে সবগুলো কুক্কুর সামনে লেজ গুটিয়ে থাকে, বাইরে থেকে নতুন কুকুরের ধারে কাছে আসার সাহস নেই।

স্টেশনের বাইরে গেলে অবশ্যি ভিন্ন কথা, অন্য কুকুরগুলোর তেজ তখন একশ গুণ বেড়ে যায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সেই মাস্তান কুকুরগুলো তাদের এলাকা পাহারা দেয়। কুক্কুকে দেখেই সেগুলো ঘাড় ফুলিয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে থাকে। জালাল লক্ষ করেছে কুক্কু কীভাবে কীভাবে জানি আগেই বুঝে যায় যে সামনে কোনো একটা কুকুর তার জন্যে অপেক্ষা করছে। মনে হয় সে

জন্যে সে খানিকটা ভয়ও পায় আর সেই ভয়টাকে দূর করার জন্যে সে ঘাড় উঁচু করে থাকে, চাপা গরগর শব্দ করে। কুক্কুর বীরত্বটুকু অবশ্যি বেশিরভাগই জালালের জন্যে, সে জানে হঠাৎ করে যদি অনেকগুলো মাস্তান কুকুর তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাহলে জালাল তাকে রক্ষা করবে। মনে হয় বড় একটা কুকুরও ছোট একটা মানুষকে অনেক ভয় পায়।

জালাল কুক্কুকে সামলে সুমলে নিয়ে যেতে থাকে। কাজটা মোটেও সোজা না। কুক্কু মাঝে-মাঝেই নিজেই আগ বাড়িয়ে অন্য কুকুরদের সাথে মারামারি করতে যায়। শুধু তাই নয় প্রত্যেকবার নতুন এলাকাতে গিয়ে একটা লাইটপোস্টের সামনে এসে সে পা তুলে একটুখানি পেশাব করে ফেলে! জালালের মনে হয় এটা করে কুক্কু এই এলাকার সব কুকুরকে অপমান করার চেষ্টা করে। তার ভাবখানা এইরকম, যে এই দেখ আমি তোমার এলাকায় পেশাব করে দিয়ে যাচ্ছি তোমরা কিছুই করতে পারছ না!

জালাল আর কুক্কু যখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে তখন ছেলেমেয়েদের স্কুল ছুটি হওয়ার সময়। কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোনো একটা স্কুল আছে সেই স্কুল থেকে সব ছেলেমেয়েরা বের হয়েছে। বড় লোকের বাচ্চারা গাড়ি চেপে হুশ হাশ করে বের হয়ে যাচ্ছে। সাবধানী মায়েরা নিজেরা এসে বাচ্চাদের স্কুল থেকে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক বাচ্চা রিকশা ভ্যানে চেঁচামেচি করতে করতে যাচ্ছে। যে সব ছেলেমেয়েদের বাসা কাছাকাছি কিংবা রিকশা করে বাসায় যাবার টাকা নেই তারা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। দেখেই বোঝা যায় কোন বাচ্চাগুলো বড়লোকের ছেলেমেয়ে আর কোন বাচ্চাগুলোর বাবা-মা গরিব টাইপ। বড়লোকের বাচ্চাগুলো কেমন জানি ঢিলেঢালা নাদুস নুদুস। গরিব টাইপের বাচ্চারা শুকনো আর টিংটিংয়ে- অনেকটা জালালের মতো।

যে বাচ্চাগুলো স্কুল শেষ করে বাসায় ফিরে যাচ্ছে তাদের অনেকেই জালালের বয়সি। এই বাচ্চাগুলো স্কুলে যেতে পারছে আর জালাল স্কুলে যেতে পারছে না, সেইজন্যে তার মোটেও হিংসা হয় না, বরং খানিকটা আনন্দ হয়। দরজা জানালা বন্ধ একটা ঘরের ভেতরে মাস্টারেরা ধরে ধরে তাকে পেটাবে আর সেই পিটুনি মুখ বন্ধ করে সহ্য করতে হবে এর কোনো অর্থ হয় না। তার তো আর বড় হয়ে জজ ব্যারিস্টার হওয়ার ইচ্ছা নাই তাহলে খামোখা স্কুলে গিয়ে কষ্ট করবে কেন? ছোট থাকতে যখন নিজের গ্রামে ছিল তখন এক দুই বছর স্কুলে গিয়েছিল। স্কুলের স্যারদের ধুম পিটুনি খেয়ে বানান করে একটু

একটু পড়তে পারে। টাকা পয়সা গুনতে গুনতে যোগ বিয়োগ খুব ভালো শিখে গেছে, এর থেকে বেশি তার জানার দরকার নেই, জানার কোনো ইচ্ছাও নেই।

মহাজন পট্টিতে গিয়ে জালাল একটা গলির ভেতর ঢুকে গেল। গলির শেষের দিকে পুরানো একটা বিল্ডিং, সেই বিল্ডিংয়ের দরজায় সে ধাক্কা দিল।

ভেতর থেকে ভারি গলায় একজন জিজ্ঞেস করল, "কে?"

জালাল বলল, "আমি ওস্তাদ। জালাল।"

"ও।" একটু পরেই দরজাটা খুট করে খুলে গেল, দরজার সামনে শুকনো একজন মানুষ জালালের দিকে তাকিয়ে বলল, "আয় জাল্লাল।"

শুকনো এই মানুষটির নাম জগলুল, জালাল তাকে ওস্তাদ ডাকে, আর এই মানুষটি জালালকে কেন জানি জাল্লাল বলে ডাকে!

জালাল কুক্কুকে বাইরে বসিয়ে রেখে তার পলিথিনের ব্যাগ বোঝাই প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে ভেতরে ঢুকল। জগলুল নামের মানুষটা—জালাল যাকে ওস্তাদ ডাকে, সাথে সাথে দরজা বন্ধ করে দিল। ভেতরে আবছা অন্ধকার, চোখটা সয়ে যেতেই একটু পরে ওস্তাদের ফ্যাক্টরিটা দেখা গেল। এই ফ্যাক্টরির মালিক ম্যানেজার শ্রমিক সবকিছুই ওস্তাদ একা! জালালের ওস্তাদ কামেল মানুষ। তার ফ্যাক্টরিতে অনেক কিছু তৈরি হয়—এখন ওস্তাদ প্লাস্টিকের খালি বোতলে পানি ভরে তার মুখটা সত্যিকারের ফ্যাক্টরির কায়দায় সিল করছে যেন সেগুলো সত্যিকারের পানির বোতল হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যায়। ওস্তাদের এক পাশে সারি সারি খালি প্লাস্টিকের বোতল। সামনে একটা বড় বালতিতে পানি। বালতির কিনারে একটা লাল রংয়ের প্লাস্টিকের মগ। ওস্তাদ মগে করে বালতি থেকে পানি নিয়ে প্লাস্টিকের খালি বোতলে ভরে ভরে এক পাশে রাখতে লাগল। জালাল পলিথিনের ব্যাগে করে আনা তার খালি প্লাস্টিকের বোতলগুলো নিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে।

ওস্তাদ বেশ অনেকগুলো বোতলে পানি ভরে ছিপিগুলো জুড়ে দেয়ার কাজ শুরু করে। একপাশে ইলেকট্রনিক্সের কাজ করার একটা সল্ডারিং আয়রন গরম হচ্ছিল। ওস্তাদ সেটা হাতে নিয়ে খুব সাবধানে পানির বোতলের ছিপিটা একটু গলিয়ে আলগা রিংটার সাথে জুড়ে দিতে লাগল। ওস্তাদের হাতের কাজ খুবই ভালো, খুব ভালো করে তাকিয়েও কেউ বুঝতে পারবে না এটা আলাদাভাবে জুড়ে দেয়া আছে। খোলার সময় সিলটা ভেঙ্গে খুলতে হবে কাজেই মনে হবে বুঝি একেবারে ফ্যাক্টরি থেকে আসা বোতল। ছিপিটা লাগানোর পর তার

উপরে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ছোট একটা টিউব ঢুকিয়ে সল্ডারিং আয়রনের জোড়া দিয়ে একটু সেক দিয়ে সেটাকেও ভালো করে লাগিয়ে নেয়। কাজ শেষ হবার পর ওস্তাদ পানির বোতলটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে মুখে একটা সন্তুষ্টির মতো শব্দ করল।

জালাল মুগ্ধ চোখে ওস্তাদের কাজ দেখছিল, বলল, "ফাস্ট ক্লাশ! আসল বুতল থাইকা ভালা।"

ওস্তাদ মাথা নেড়ে বুকে থাবা দিয়ে বলল, "জগলুল ওস্তাদের হাতের কাজে কোনো খুত নাই।"

"না ওস্তাদ। কুনো খুত নাই।"

"চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়িস ধরা।"

জালাল আপত্তি করল, "জে না ওস্তাদ। এইটা তো চুরি না। এইটা তো ফ্যাক্টরি। এইখানে তো কেউ চুরি করে না ওস্তাদ। এইখানে কারো কুনু ক্ষতি হয় নাই।"

ওস্তাদ মাথা নাড়ল, বলল, "তা ঠিক। আমি তো বোতলে ময়লা পানি দেই না। টিউবওয়েলের পরিষ্কার পানি দেই। খাটি পানি।" ওস্তাদ আরেকটা বোতল রেডি করতে করতে বলল, "কিন্তুক পুলিশ দারোগা টের পেলে খবর আছে।"

"টের পাবি না ওস্তাদ। কুনু ভাবে টের পাবি না।"

"না পাইলেই ভালো। তুই খবরদার কাউরে বলবি না।"

"কী বলেন ওস্তাদ! আমি কারে বলমু? কুনুদিন বলমু না।"

বেশ কিছুক্ষণ কাজ করে জগলুল ওস্তাদ একটু বিশ্রাম নেয়। খুব যত্ন করে একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা একটা টান দিয়ে উপর দিকে ধোঁয়া ছাড়ল। জালাল মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে, তারও মনে হয় সিগারেট খাওয়াটা শিখতে হয়। তাহলে সেও এইরকম সুন্দর করে আকাশের দিকে ধোঁয়া ছাড়তে পারবে। তবে কাজটা সোজা না। একদিন চেষ্টা করে দেখেছে কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা।

ওস্তাদ বলল, "আমার ফ্যাক্টরি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। আমার সমস্যা কোন জায়গায় জানিস জাল্লাল?"

"কুন জায়গায়?"

"মার্কেটিং। যদি ঠিকমতো মার্কেটিং করতে পারতাম তাহলে এতোদিনে ঢাকার মালিবাগে একটা ফ্ল্যাট থাকত।"

বিষয়টা জালাল ঠিক বুঝল না কিন্তু সেটা নিয়ে সে মাথা ঘামাল না, ওস্তাদের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিল।

ওস্তাদ বলল, "তয় মার্কেটিংয়েও কিছু সমস্যা আছে।"

"কী সমিস্যা?"

"বেশি মার্কেটিং মানে বেশি মানুষ। আর বেশি মানুষ মানে বেশি জানাজানি। জানাজানি যদি একটু ভুল জায়গায় হয় তাহলেই আমি ফিনিস।"

জালাল আবার বুঝে ফেলার ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল, বলল, "অ।"

ওস্তাদ সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, "সেইজন্যে আমি দুই চারজন বিশ্বাসী মানুষ ছাড়া আর কাউরে আমার বিজনেসের কথা বলি না।"

জালাল ওস্তাদের দুই চারজন বিশ্বাসী মানুষের মাঝে একজন সেটা চিন্তা করেই তার গর্বে বুক ফুলে উঠল।

জালাল একেবারে সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত ওস্তাদের বাসায় থাকল। ওস্তাদ তাকে দিয়ে কিছু টুকটাক কাজ করিয়ে নিল। সে ঘরদোর একটু পরিষ্কার করল, ওস্তাদের সিগারেটের গোড়া, কলার ছিলকে, চিপসের খালি প্যাকেট বাইরে ফেলে এল। মোড়ের টিউবওয়েল থেকে এক বালতি পানি এনে দিল। বিকাল বেলা চা নাস্তা খাওয়ার জন্য চায়ের দোকান থেকে লিকার চা আর ডালপুরি কিনে আনল।

ওস্তাদ তার হাতের কাজ শেষ করে জালালের পলিথিনের ব্যাগের ভেতরের পানির খালি বোতলগুলো বুঝে নিল। তার বদলে ওস্তাদ তাকে এক ডজন পানির বোতল দিল। হাফ লিটারের বোতল, ঠিক করে বিক্রি করতে পারলে তার একশ টাকা নিট লাভ!

ওস্তাদকে সালাম দিয়ে জালাল ঘর থেকে বের হয়ে আসে। ঘরের দরজার কাছে বসে কুক্কু খুব মনোযোগ দিয়ে বিদঘুটে একটা হাড় চিবাচ্ছিল। হাড়টাতে খাওয়ার কিছু নেই, মনে হয় সময় কাটানোর জন্যে এটা কামড়াচ্ছে। কোথা থেকে এই বিদঘুটে হাড় খুঁজে বের করেছে কে জানে। জালালকে পানির বোতলের প্যাকেট নিয়ে বের হতে দেখে কুক্কু তার হাড় ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ল।

স্টেশনে ফিরে আসার সময় আবার সেই একই কাহিনী। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মাস্তান কুকুরেরা তাদের এলাকা পাহারা দিচ্ছে। কুক্কু তাদের সাথে

মারামারি করতে করতে ফিরে আসছে। মারামারিতে জিততে পারলে কাছাকাছি লাইটপোস্টে পা তুলে সে একটুখানি পেশাব করে পুরো কুকুর বাহিনীকে অপমান করার চেষ্টা করছে।

ওস্তাদের বাসায় যাবার সময় ছিল হালকা খালি প্লাস্টিকের বোতল। এখন ফিরে যাবার সময় পানি ভরা বোতল। বোতলগুলো অনেক ভারি— একটা রিকশা নিতে পারলে হত কিন্তু জালাল রিকশা নিয়ে পয়সা নষ্ট করল না। টাকা পয়সা রোজগার করা যে কথা, খরচ না করে বাঁচিয়ে ফেলা সেই একই কথা। অনেকদিন থেকে সে টাকা জমানোর চেষ্টা করছে।

রাত গভীর হলে মজিদ তার বাড়ি চলে গেল, সে স্টেশনের কাছেই টিএন্ডটি বস্তিতে থাকে। মতির মা তার কাজ শেষ করে বাড়ি যাবার সময় মতিকে নিয়ে গেল। অন্য যারা আছে তাদের বাড়িও নেই মা-বাবার খোঁজও নেই, তারা স্টেশনেই থাকে। এটাই তাদের বাড়ি ঘর। এখানে তারা নিজেরাই একজন আরেকজনের বাবা মা ভাই বোন সবকিছু। তারা এমনিতে সবসময় একজন আরেকজনের সাথে ঝগড়াঝাটি মারপিট করছে কিন্তু তারপরেও কীভাবে কীভাবে জানি একজন আরেকজনের উপর নির্ভর করে। স্টেশনে নানারকম বিপদ আপদ, মাঝে মাঝে গভীর রাতে পুলিশ এসে তাদেরকে মারধোর করে তাড়িয়ে দেয়। ফেনসিডিল, হেরোইন খাওয়া কিছু খারাপ মাস্তান আছে মাঝে মাঝে তারা হামলা করে তাদের টাকা পয়সা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। সবাই একসাথে থাকলে এই রকম বিপদ আপদ কম হয়। কিংবা যখন হয় তখন সেটা সামাল দেয়া যায়।

শেষ ট্রেনটা চলে যাবার পর তারা সবাই গুটি গুটি মেরে শুয়ে গেল। জালাল একপাশে তার মাথার কাছে কুক্কু। শাহজাহান একটু বিলাসী তার একটা ময়লা কাথা পর্যন্ত আছে। জেবা আর মায়া দুইজন একজন আরেকজনকে জড়াজড়ি করে ধরে শুয়ে আছে। প্লাটফর্মের শেষ মাথায় সিঁড়ির নিচে কাউলা আর তার মায়ের সংসার। প্লাটফর্মে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে আছে কিছু ভিখিরি, থুরথুরে একজন বুড়ি, একজন লম্বা চুল দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী। এমনিতে সারাদিন স্টেশনে থাকে না কিন্তু রাতে ঘুমানোর জন্যে শহর থেকে বেশ কিছু মানুষ আসে। তাদের কারো কারো চেহারা ভালো মানুষের মতো আবার কেউ কেউ ষণ্ডা ধরনের, লাল চোখ দেখে ভয় লাগে।

জালাল কুক্কুকে জড়িয়ে ধরে একসময় ঘুমিয়ে গেল। গভীর রাতে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায়। কেন ভেঙেছে সে জানে না। তার মনে হলো সে একটা কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে বোঝার চেষ্টা করল তারপর ওঠে বসল। মনে হয় জেবা। জালাল ওঠে বসল, তার ধারণা সত্যি। জেবা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। কান্নার সাথে সাথে তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। জালাল জিজ্ঞেস করল, "জেবা। কী হইছে, কান্দস ক্যান?"

সাথে সাথে জেবার কান্নার শব্দ থেমে গেল। জালাল আবার ডাকল, "জেবা।"

জেবা বলল, "উঁ।"

"কান্দস ক্যান?"

জেবা সহজ গলায় বলল, "কে কইছে কান্দি? কান্দি না।" একটু থেমে যোগ করল, "মনে হয় খোয়াব দেখছি।"

জালাল জানে খোয়াব বা স্বপ্ন না, জেবা সত্যিই কাঁদছে। কিন্তু স্বীকার করতে চাচ্ছে না। কখনো স্বীকার করে না। সবসময় ভান করে সে খুব শক্ত মেয়ে কোনো কিছুতে কাবু হয় না। কিন্তু জালাল জানে জেবার ভেতরেও কোনো জায়গায় একটা দুঃখ আছে, কষ্ট আছে। তার নিজের যেরকম আছে। প্লাটফর্মে যারা শুয়ে আছে তাদের সবার যেরকম আছে। কুক্কু ছাড়া—মনে হয় শুধু কুক্কুর মনে কোনো দুঃখ নেই।

জালাল আবার শুয়ে পড়ল। অনেকটা অভ্যাসের বশে কোমরে প্যান্টের ভাঁজে হাত দিল, সে যেটুকু টাকা জমাতে পারে প্যান্টের এই ভাঁজে লুকিয়ে সেলাই করা আছে। গত রাতে লুকিয়ে একবার গুনেছে, সাতশ টাকা হয়েছে—তার জন্যে সাতশ টাকা অনেক টাকা। প্যান্টের পকেটে সবসময় কিছু খুচরা টাকা রাখে, যদি কোনো হেরোইনখোর তাদের উপর হামলা করে তাহলে এই টাকাগুলো নিয়েই যেন বিদায় হয়, তার আসল টাকা যেন ধরতে না পারে। জালাল যখন প্যান্টের ভাঁজে হাত দিয়ে তার জমানো টাকাগুলো ছুয়ে দেখে তখনই তার মনটা ভালো হয়ে যায়।

আজকে কেন জানি তার মনটা ভালো হলো না। কেন জানি তার মনটা খারাপ হয়ে থাকল। মাঝে মাঝেই এরকম হয়।

২.

ইভা রিকশা থেকে নেমে স্টেশনের দিকে তাকাল, চকচকে নতুন মডার্ন টাইপের একটা বিল্ডিং—দেখে স্টেশন মনেই হয় না। রেল স্টেশন হলেই কেন জানি মনে হয় এটাকে লাল ইটের পুরানো একটা দালান হতে হবে। ইভা যখন ছোট ছিল তখন বাবার সাথে অনেক জায়গায় গিয়েছে—অনেক রেল স্টেশন দেখেছে, তাই স্টেশনের একটা ছবি তার মাথায় রয়ে গেছে—সেই ছবির সাথে না মিললে ইভার কেন জানি মনে হয় তাকে বুঝি কেউ ঠকিয়ে দিয়েছে!

রিকশা ভাড়া দিয়ে সে রিকশা থেকে নামল। ছোট ব্যাগটা হাতে নিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে কাচের দরজা ঠেলে স্টেশনের ভেতরে ঢুকে। আগামী তিনমাস প্রত্যেক বৃহস্পতিবার তাকে এই স্টেশনে আসতে হবে। হেড অফিস থেকে তাকে তিন মাসের জন্যে এখানে পাঠিয়েছে। এখানে যে কয়টা ব্রাঞ্চ অফিস রয়েছে তার প্রত্যেকটাতে ট্রেনিং দিতে হবে। অপরিচিত জায়গায় সবাই অপরিচিত মানুষ। এখানে টানা তিন মাস ইভা থাকতে পারবে না। তাই ঠিক করেছে শনিবার রাতে ঢাকা থেকে এখানে পৌঁছাবে আবার বৃহস্পতিবার দুপুরে আবার ঢাকা ফিরে যাবে। ঢাকা শহরে রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম, বাতাসে ধূলাবালি আর পোড়া ডিজেলের গন্ধ, ফুটপাথে মানুষের ভিড়, অফিসে রাগি রাগি চেহারার মানুষ, দোকানপাটে জিনিসপত্রের আকাশ ছোঁয়া দাম তারপরেও ঢাকা শহরের বাইরে গেলে ইভার কেন জানি দম বন্ধ হয়ে আসে।

ইভা এক নম্বর প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াল। ট্রেন আসার সময় হয়নি, প্যাসেঞ্জাররা এর মাঝে আসতে শুরু করেছে। ইভা আস্তে আস্তে প্লাটফর্মটা ঘুরে ঘুরে দেখে। পৃথিবীর সব রেল স্টেশনের মাঝেই একটা মিল আছে, মিলটা কী ইভা ঠিক ধরতে পারে না।

কে যেন ঠাণ্ডা একটা হাত দিয়ে তার কনুইটা ছুয়েছে। ইভা ঘুরে তাকাল। তিন চার বছরের বাচ্চা একটা মেয়ে, মাথায় লাল রুক্ষ চুল, সারা শরীরে ধুলো

ময়লার একটা আস্তরণ, ময়লা একটা গেঞ্জি হাঁটু পর্যন্ত চলে এসেছে। বাচ্চাটার চেহারায় অবশ্যি একটা তেজি ভাব আছে দেখে রোগা কিংবা দুর্বল মনে হয় না। বাচ্চা মেয়েটা মুখের মাঝে খুব দুঃখ দুঃখ একটা ভাব ফুটিয়ে বলল, "আফা দুইটা টেহা দিবেন?"

ইভা লক্ষ করল মেয়েটার সামনের দাঁতগুলো নেই। জিজ্ঞেস করল, "কী করবে টাকা দিয়ে?"

"ভাত খামু।"

"ভাত খাও নাই?"

"নাহ!" মেয়েটা চোখ সরিয়ে নিল, ইভা বুঝতে পারল বাচ্চা মেয়েটা এখনো চোখের দিকে তাকিয়ে সরল মুখে মিথ্যে কথা বলা শিখেনি। ইভা তার ব্যাগ খুলে চকচকে একটা দুই টাকার নোট বের করে জিজ্ঞেস করল, "কী নাম তোমার?"

"মায়া।"

ইভা মনে মনে ভাবল এই নামটিই তার হওয়ার কথা, তারপর দুই টাকার নোটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই যে নাও।"

মায়া নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না—কোনো বকাবকি নেই, রাগারাগি নেই এতোটুকু বিরক্ত না হয়ে চাওয়া মাত্রই দুই টাকা দিয়ে দিল? প্রায় খপ করে নোটটা নিয়ে সে উল্টোদিকে হাঁটতে থাকে। কয়েক পা যেতেই তার জেবার সাথে দেখা হলো, মায়া চোখ বড় বড় করে বলল, "একটা আফা চাইতেই দুই টেহা দিল।"

"কোন আফা?"

মায়া দেখিয়ে দেয়, "হুই যে লাল শাড়ি কালা ব্যাগ, সুন্দর মতন আফা।"

কাজেই এবার জেবা তার ভাগ্য পরীক্ষা করতে গেল। কী আশ্চর্য! চাওয়া মাত্রই সেও দুই টাকা পেয়ে গেল, মুখ কাচুমাচু পর্যন্ত করতে হলো না। মুহূর্তের মাঝে স্টেশনের সব বাচ্চার কাছে খবরটা পৌঁছে যায়। এক নম্বর প্লাটফর্মে সুন্দর মতন একজন লাল শাড়ি পরা আপার কাছে চাইলেই সে দুই টাকা দিয়ে দিচ্ছে। শাহজাহান দুই টাকা নিয়ে নিল, মজিদ দুই টাকা নিয়ে নিল, মতিও গিয়ে একটা চকচকে দুই টাকার নোট পেয়ে গেল।

জালাল জগলুল ওস্তাদের তৈরি করা হাফ লিটারের পানির বোতল বিক্রি করছিল, চাইতেই দুই টাকা পাওয়া যাচ্ছে শুনে সেও পানি বিক্রি বন্ধ রেখে সুন্দর মতন আপার কাছ থেকে দুই টাকা নিয়ে নিল। টাকাটা পকেটে রেখে জালাল বলল, "আপা মিনারেল নিবেন?"

ইভা জিজ্ঞেস করল, "কী নিব?"

জালাল পানির বোতলটাকে দেখিয়ে বলল, "মিনারেল।"

ইভা ফিক করে হেসে বলল, "ও পানি!"

"জ্বি আপা।"

বোতলের পানি বিক্রি করার সময় পানি না বলে কেন এটাকে মিনারেল বলতে হয় জালাল সেটা ভালো করে জানে না। কিন্তু এই আপা যদি এইটাকে পানি বললেই কিনতে রাজি হয় তার সেটাকে পানি বলতে তার কোনো আপত্তি নেই।

ইভার ব্যাগে ছোট একটা পানির বোতল ছিল তারপরেও সে জালালের কাছ থেকে এক বোতল পানি কিনে নিল। ভেজাল পানি।

ট্রেন আসার আগে আরো অনেক বাচ্চা হাজির হলো, ইভা ধৈর্য ধরে সবাইকে একটা করে দুই টাকার নোট দিল। তার ব্যাগে সবসময় দুই টাকার নোটের একটা বান্ডিল থাকে, কোথাও সে পড়েছে এই নোটের ডিজাইনটা নাকি একটা পুরস্কার পেয়েছে। সেজন্যে এটা সে সাথে রাখে।

ট্রেনে ওঠার সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষ ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কাজটা ঠিক করলেন না।"

ইভা থতমত খেয়ে বলল, "কোন কাজটা?"

"এই যে সব বাচ্চাগুলোকে দুই টাকা করে ভিক্ষা দিলেন। এদের অভ্যাস নষ্ট করে দিলেন।"

"অভ্যাস নষ্ট করে দিলাম?"

"হ্যাঁ। এদেরকে ভিক্ষা করতে শিখালেন।"

"আমি ভিক্ষা করতে শিখালাম?"

মানুষটা ফোঁস করে আরেকটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এই দেশে এই রকম রাস্তাঘাটের বাচ্চা কতোজন আপনি জানেন?"

এইটা সত্যিকারের প্রশ্ন না তাই ইভা কিছু বলল না। মানুষটা বলল, "আপনি দুই টাকা করে দিয়ে এদের সমস্যা মিটাতে পারবেন না। এইটা কোনো সমাধান না।"

ইভা এবারে মানুষটার দিকে তাকাল। মানুষটা লম্বা, মাথার সামনের দিকে চুল নেই, ঝাটার মতো গোঁফ। চেহারা দেখে মনে হয় এই মানুষটার নিজের উপর খুব বিশ্বাস, মানুষটার ধারণা সে সবকিছু জানে আর সে যে কথাটা বলেছে সেটাই হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র সত্যি কথা। মানুষটা চাইছে ইভা কিছু একটা বলুক, আর তখন সে আরো নতুন উৎসাহে ইভার সাথে তর্ক শুরু করবে। তাই ইভা কিছু বলল না, ছোট বাচ্চারা অর্থহীন কথা বললে বড়রা

তাদের দিকে তাকিয়ে যেভাবে হাসে সেভাবে মানুষটার দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর বলল, "আপনি ঠিক বলেছেন!" তারপর তাকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নিজের সিটটা খুঁজে বের করে বসে পড়ল। চোখের কোনা দিয়ে তাকিয়ে দেখল মানুষটা কেমন যেন হতাশ হয়ে তাকিয়ে আছে—তর্ক করার এরকম একটা সুযোগ পেয়েও একজন মানুষ যে তর্ক না করেই বসে যেতে পারে মনে হয় মানুষটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

পরের সপ্তাহে বৃহস্পতিবার দুপুর বেলা আবার ইভা স্টেশনে এসে হাজির হলো। আবার সে তার ছোট ব্যাগটা হাতে নিয়ে এক নম্বর প্লাটফর্মে হাঁটছে তখন আবার সে তার কনুইয়ে ঠাণ্ডা একটা হাতের স্পর্শ টের পেল। ঘুরে তাকিয়ে দেখে লাল রুক্ষ চুলের সেই ছোট মেয়েটি। ময়লা একটা গেঞ্জি হাঁটু পর্যন্ত চলে এসেছে। ফোকলা দাঁত দিয়ে বাতাস বের করে বলল, "আফা। দুইটা টেহা দিবেন?"

ইভা বাচ্চাটার দিকে তাকাল। বলল, "কী খবর মায়া?"

মায়া চমকে ওঠে এবং হঠাৎ করে সে ইভাকে চিনে ফেলল, সাথে সাথে সে তার সবগুলো ফোকলা দাঁত বের করে হাসল বলল, "দুই টেহি আফা!"

"কী আপা?"

"দুই টেহি। আফনি সবাইরে দুই টেহা দেন হের লাগি আফনি দুই টেহি আফা!"

ইভা বড় বড় চোখে মায়ার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি দুই টেকী আপা?"

মায়া মাথা নাড়ল। ইভা তখন তার ব্যাগ থেকে বের করে দুটি টাকা বের করে মায়াকে দিল। মায়া চকচকে নতুন নোটটা হাতে নিয়ে একবার তার গালে ছুইয়ে হাতের অন্যান্য টাকার সাথে রেখে দিল। গতবারের মতো মায়া আজকে সাথে সাথে চলে গেল না, কাছে দাঁড়িয়ে ইভাকে ভালো করে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে থাকে। একটু পরে বলল, "আফা। আপনার শাড়িটা কয় টেহা?"

ইভা একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল, শাড়িটা সে বছর খানেক আগে অনেক দাম দিয়ে কিনেছে কিন্তু এই বাচ্চাটাকে সেটা বলার কোনো যুক্তি নেই। তাই মাথা নেড়ে বলল, "জানি না। এটা তো আমাকে একজন দিয়েছে তাই কত দাম জানি না।"

"কে দিছে? আফনের জামাই?'

ইভা হেসে ফেলল, বলল, "না, আমার জামাই নাই। অন্য একজন দিয়েছে।"

"আফনের শাড়িটা অনেক সোন্দর।"

ইভা বলল, "থ্যাংক ইউ।"

মায়া সাথে সাথে হি হি করে হাসতে থাকে। ইভা অবাক হয়ে বলল, "কী হলো? হাস কেন?"

মায়া হাসতে হাসতে বলল, "আফনে আমারে কন থ্যাংকু।"

এর মাঝে কোন অংশটা হাসির ইভা ঠিক বুঝতে পারল না কিন্তু সেটা নিয়ে সে মাথাও ঘামাল না। মায়ার ফোকলা দাঁতের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কী জান, তোমার সামনে দাঁত নাই।"

মায়া সাথে সাথে ঠোঁট দিয়ে তার মুখটা বন্ধ করে ফেলল। তার ভঙ্গি দেখে মনে হলো দাঁত না থাকাটা খুবই লজ্জার একটা ব্যাপার আর সেটা কোনোভাবেই কাউকে দেখানো যাবে না।

মায়া বলল, "তোমার দাঁত কেমন করে পড়ল? মুখ হা করে ঘুমিয়েছিলে আর ইঁদুর এসে খেয়ে ফেলেছে?"

মায়া মুখ বন্ধ রেখেই জোরে জোরে মাথা নেড়ে অস্বীকার করল কিন্তু ইভা চারপাশ থেকে হাসির শব্দ শুনতে পেল। সে লক্ষ করেনি বেশ কয়েকজন বাচ্চা এর মাঝে আশে পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছে এবং ঘুমের মাঝে ইঁদুর এসে দাঁত খেয়ে ফেলার বিষয়টা তাদের সবারই খুব পছন্দ হয়েছে। একজনে হাতে কিল দিয়ে বলল, "ইন্দুরে খাইছে, ইন্দুরে খাইছে! আমি দেখছি হে মুখ হা কইরা ঘুমায়।"

ইভা বলল, "তুমি এতো খুশি হচ্ছ কেন? তুমি যখন ছোট ছিলে তোমারও তো দাঁত ছিল না! তুমিও নিশ্চয়ই মুখ হা করে ঘুমিয়েছিলে!"

জেবা হাত বাড়িয়ে বলল, "আফা। দুইটা টেহা দিবেন?"

তখন অন্য সবাই হাত বাড়িয়ে দাঁড়াল। ইভা একটা নিঃশ্বাস ফেলে সবাইকে একটা করে দুই টাকার নোট দিল। টাকা নিয়ে বাচ্চাগুলো উধাও হয়ে যায়, স্টেশনে প্যাসেঞ্জাররা এসেছে এখন তাদের অনেক কাজ।

ঠিক তখন খুব কাছে থেকে কে একজন বলল, "কাজটা ভালো করলেন না।"

গলার স্বর শুনে ইভা চমকে ওঠে পাশে তাকাল। সেদিনের লম্বা এবং মাথার চুল ওঠে যাওয়া মানুষটা আজকেও স্টেশনে এসেছে। মনে হচ্ছে এই

মানুষটাও তার মতো প্রতি বৃহস্পতিবার ঢাকা যায়। মানুষটা মুখ শক্ত করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ইভা মানুষটার দিকে তাকাতেই সে মাথা নেড়ে আবার বলল, "কাজটি ভালো করলেন না।"

ইভা উত্তর দেবার চেষ্টা করল না, মাথা নেড়ে মেনে নিল যে কাজটা ভালো হয়নি। গত সপ্তাহে এই মানুষটার কথা শুনে অবাক হয়েছিল আজকে সে খুব বিরক্ত হলো। কথার উত্তর না দিলে মানুষটি চলে যাবে ভেবে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু মানুষটি চলে গেল না, বরং আরেকটু কাছে এসে বলল, "এই যে এদের সাথে ভালো করে কথা বলেন এইটা হচ্ছে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস।"

ইভা এবারেও কোনো কথা বলল না, অবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকাল। এভাবে গায়ে পড়ে কেউ কথা বলতে পারে সে চিন্তাও করতে পারেনি। মানুষটি ইভার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করল, বলল, "আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন এই লোকটা কে। এইভাবে গায়ে পড়ে কথা বলছে কেন! পাগল নাকি! আমি আপনাকে রি এশিউর করছি আমি পাগল না। আমার নাম মশিউর রহমান। ডক্টর মশিউর রহমান। আমি এনথ্রোপলজির প্রফেসর, কানাডা থাকি। ছুটিতে দেশে বেড়াতে এসেছি। কাল চলে যাব।"

ইভা এবারে ভালো করে মানুষটার দিকে তাকাল, মানুষটা দেশের বাইরে থাকে তাই এতো সহজে অপরিচিত মানুষের সাথে গায়ে পড়ে কথা বলতে শিখেছে। অপরিচিত একজন মেয়ের সাথেও কোনো সংকোচ ছাড়া কথা বলতে পারে। ইভা মানুষটার দিকে তাকাল তখন এনথ্রোপলজির প্রফেসর মানুষটা বলল, "আপনি জানতে চান না কেন কাজটা ডেঞ্জারাস?'

"কেন?"

"এই বাচ্চাগুলোর সেফটি এন্ড সিকিউরিটির জন্যে। এদের লাইফ স্টাইল আমার আপনার লাইফ স্টাইলের মতো না। এদের লাইফ স্টাইল অনেক কঠিন। এদেরকে এখানে টিকে থাকা শিখতে হয়। প্রতি মুহূর্তে এদের রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়। ওদের চারপাশে কোনো বন্ধু নেই—ওদের জন্যে কারো কোনো মমতা নেই।"

ইভা মনে মনে বলল, "আপনারও নেই!" মনে মনে বলেছে বলে এনথ্রোপলজির প্রফেসর কথাটা শুনতে পেল না, তাই সে কথা বলেই চলল, "বেঁচে থাকার জন্যে ওদের নিজেদের মতো করে স্কিল তৈরি করতে হয়। সেখানে কেউ যদি ওদের সাথে ভালো ব্যবহার করে তাহলে ওরা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। ওদের সব হিসাব গোলমাল হয়ে যায়। সেজন্যে আপনি যখন তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করছেন তখন আসলে আপনি তাদের ক্ষতি করছেন।"

ইভা বলল, "আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

ইভার কথা শুনে মানুষটার নিরুৎসাহী হবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না বরং আরো বেশি উৎসাহ নিয়ে সে কথা বলতে শুরু করল। বলল, "বুঝতে পারছেন না? মূল বিষয়টা খুব সহজ। এদেরকে আপনি আপনার নিজেকে দিয়ে বিচার করবেন না। আপনি আপনার চারপাশে যাদেরকে দেখেন তাদেরকে দিয়েও বিচার করবেন না। এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের মোরালিটি-নৈতিকতা বোধ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপনি আমি যে কাজটি করতে দেখে আঁতকে উঠব এরা অবলীলায় সেটা করে ফেলবে। সারভাইবালস ইন্সটিংট।"

ইভা এতোক্ষণে নতুন করে বিরক্ত হতে শুরু করেছে। যে মানুষের কথা শুনে আগা মাথা বোঝা যায় না তার কথা শোনা থেকে যন্ত্রণা আর কী হতে পারে? ইভা এবারে কানাডাবাসি এনথ্রোপলজির প্রফেসরের সাথে কথাবার্তা শেষ করে ফেলতে চাইল, বলল, "আপনি যা বলছেন সেগুলো নিশ্চয়ই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা—আমি অবশ্যি তার কিছুই বুঝতে পারি নাই। তাতে কোনো সমস্যা নাই আমি স্টক মার্কেটও বুঝি না ক্রসফায়ারও বুঝি না। অনেক জিনিস না বুঝেই আমি দিন কাটাই। কোনো সমস্যা হয় না। থ্যাংকু।"

ইভা কথা শেষ করে হাঁটতে শুরু করল, ইঙ্গিতটার মাঝে কোনো রকম রাখ ঢাক নাই—তোমার সাথে অনেক কথা হয়েছে এবারে তুমি থাম, আমি গেলাম!

মানুষটা হয় ইঙ্গিতটা বুঝল না, না হয় বোঝার চেষ্টা করল না কিংবা বুঝেও না বোঝার ভান করে ইভার পিছনে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "আপনাকে স্পেসিফিক এক্সাম্পল দেই তাহলে বুঝবেন। মনে করেন—"

ইভা না শোনার ভান করে হেঁটে যেতে থাকে, মানুষটা তখন হেঁটে তার সামনে এসে বলল, "মনে করেন এই বাচ্চাগুলোর একজন এসে আপনার কাছে দুই টাকা চাইল। আপনি বললেন আমার কাছে ভাংতি দুই টাকা নেই। একটা দশ টাকার নোট আছে তুমি টাকাটা ভাংগিয়ে এনে দাও। তারপর আপনি বাচ্চাটাকে দশটাকার নোটটা দেন—দেখবেন বাচ্চাটা দশ টাকার নোট নিয়ে ভেগে যাবে!"

ইভা এই প্রথম মানুষটার একটা কথা বুঝতে পারল। মানুষটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার তাই ধারণা?'

"হ্যাঁ। ধারণা না এটা হচ্ছে সত্য। ট্রুথ ওয়ে অফ লাইফ। আপনি মনে করবেন না সে জন্যে আমি এই বাচ্চাটাকে দোষী বলব। আমি—"

ইভা মানুষটাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন আমি যদি একটা ছোট বাচ্চাকে দশ টাকার একটা নোট দিয়ে ভাংতি করে আনতে বলি সে টাকাটা নিয়ে পালিয়ে যাবে?"

"অফকোর্স। হি শুড।"

"আর যদি না যায়?"

"তাহলে আমি বলব আমার হাইপোথিসিস ভুল। আমি পরাজয় স্বীকার করে নেব।"

"কার কাছে পরাজয় স্বীকার করবেন?"

"আপনার কাছে।"

ইভা বিরক্ত হয়ে বলল, "আমি তো কোনো গেম খেলছি না যে এখানে জয় পরাজয় আছে!"

"শুধু কী গেমে জয় পরাজয় থাকে? আইডিয়াতেও থাকে।"

"থাকলে থাকুক আমার সেখানে কোনো মাথা ব্যথা নেই।" ইভা একবারে পাকাপাকিভাবে কথাবার্তা শেষ করার জন্যে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন জালাল এসে হাজির হলো। সে এই মাত্র খবর পেয়েছে গত সপ্তাহের দুই টেকী আপা আজকেও এসেছে। আজকেও সবাইকে চাইতেই দুই টাকা করে দিচ্ছে। জালাল ইভার দিকে তাকিয়ে মুখ কাচুমাচু করে বলল, "আফা, সবাইরে দিছেন, আমারে দুই টেহা দিবেন না?"

এনথ্রোপলজির প্রফেসর মনে হলো এই সুযোগটার জন্যে অপেক্ষা করছিল, গলা বাড়িয়ে বলল, "তুই আমার কাছে আয়, আমি দিচ্ছি। আপাকে ছেড়ে দে।"

জালাল কী করবে বুঝতে না পেরে একবার ইভার মুখের দিকে আরেকবার চুল নেই লম্বা মানুষটার দিকে তাকাল। মানুষটা পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করে বলল, "আমার কাছে ভাংতি নাই, তুই টাকাটা ভাঙ্গিয়ে আন—"

ইভা তখন তার ব্যাগ খুলে বলল, "দাঁড়াও।"

সাথে সাথে জালাল ইভার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ইভা বলল, "আমার ভাংতি শেষ হয়ে গেছে। তুমি এই একশ টাকার নোটটা ভাঙ্গিয়ে নিয়ে এস। পারবে না?"

জালালের চোখ দুটি চকচক করে উঠল। বলল, "পারমু আফা।"

ইভা নোটটা বাড়িয়ে দেয়, জালাল কাঁপা হাতে নোটটা হাতে নিল। আজকে সকালে সে কার মুখ দেখে উঠেছিল? এরকম কপাল একজনের জীবনে আর কয়দিন আসে?

জালাল নোটটা নিয়ে ভিড়ের মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর এনথ্রোপলজির প্রফেসর হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল, বলল, "আপনি এটা কী করলেন? দশ টাকা দিলে তবুও হয়তো একটা কথা ছিল, হয়তো একটা চান্স ছিল! একশ টাকার লোভ এই বাচ্চা ছেলে কেমন করে সামলাবে? আমিই সামলাতে পারব না।" কথা শেষ করে মানুষটা হা হা করে হাসল।

ইভা কোনো কথা বলল না।

মানুষটা বলল, "আমি ভেবেছিলাম আপনার সাথে একটা ফেয়ার কম্পিটিশন করি আপনি আমাকে ওয়াক ওভার দিয়ে দিলেন।"

ইভা এবারেও কোনো কথা বলল না।

"আমি সরি, শুধু শুধু আমার কথায় একশটা টাকা নষ্ট করলেন।"

ইভা এবারেও কোনো কথা বলল না।

"আমি যাই। আপনাকে আর বিরক্ত করব না।"

ইভা ভাবল বলল, "আগেই যাবেন না, দেখে যান।" কিন্তু কিছু বলল না, সম্মতির ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল। মানুষটি তখন ভিড়ের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ইভা ভেবেছিল পাঁচ মিনিটের মাঝে ছেলেটা ভাংতি টাকা নিয়ে আসবে। ছেলেটি এলো না। দশ মিনিট পরেও এলো না। পনেরো মিনিট পর স্টেশনে ঘোষণা দিল ট্রেন আধা ঘণ্টা লেট তখনো ছেলেটা এলো না। বিশ মিনিট পরেও যখন এলো না তখন ইভা বুঝতে পারল এনথ্রোপলজির প্রফেসরের কথা সত্যি, ছেলেটা আর আসবে না। হয়তো একশ টাকার একটা নোট না দিয়ে দশ টাকার একটা নোট দেয়া উচিত ছিল তাহলে হয়তো আসত, হয়তো ইভা নিজেই বাচ্চাটাকে লোভের মাঝে ঠেলে দিল। ইভার মনটা একটু খারাপ হল। সারা জীবনই সে মানুষকে বিশ্বাস করে এসেছে। মানুষ সেজন্যে অনেকবার তাকে কষ্ট দিয়েছে কিন্তু তারপরেও সে মানুষকে বিশ্বাস করে এসেছে। সে কখনোই মানুষের উপর থেকে বিশ্বাস হারাবে না। শুধু মনের ভেতর খচখচ করছে—এইটুকুন একটা ছেলে তার বিশ্বাসটাকে সম্মান করল না? নিজেকে কেমন জানি অপমানিত মনে হচ্ছে। ভাগ্যিস হামবাগ কানাডার প্রফেসর আশেপাশে নেই, তাহলে মনে হয় অপমানটা আরো বেশি গায়ে লাগত।

ত্রিশ মিনিট পর স্টেশনে ঘোষণা দিল ট্রেনটা আজকে এক নম্বর প্লাটফর্মের বদলে দুই নম্বর প্লাটফর্মে আসবে। প্যাসেঞ্জাররা সবাই যেন দুই নম্বর প্লাটফর্মে চলে যায়। ইভা তখন শেষবার এদিক সেদিক তাকিয়ে ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে দুই নম্বর প্লাটফর্মের দিকে যেতে থাকে। ছেলেটা যদি এখন একশ টাকার ভাংতি নিয়ে চলেও আসে আর তাকে খুঁজে পাবে না।

দুই নম্বর প্লাটফর্মে ইভার সাথে আবার এনথ্রোপলজির প্রফেসরের সাথে দেখা হয়ে গেল। প্রফেসর কাছে এসে নিচু গলায় বলল, "ড্র।"

ইভা ঠিক বুঝতে পারল না, বলল, "কী বললেন?"

"বলেছি ড্র হয়ে গেল।"

"কীসের ড্র?"

"আমাদের কম্পিটিশানের। আপনি এখন বলতে পারবেন ছেলেটা হয়তো ঠিকই ভাংতি নিয়ে এসেছিল কিন্তু আপনাকে আর খুঁজে পায় নাই। টেকনিক্যাল কারণে ড্র হয়ে গেল।"

ইভা কিছু বলল না, সে টেকনিক্যাল কারণ দেখিয়ে ড্র করতে চায়নি। সে একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে জিততে চেয়েছিল। পারল না।

ঠিক যখন ট্রেনটা এসেছে, ইভা যখন ট্রেনে উঠতে যাবে তখন সে পিছনে উত্তেজিত একটা গলা শুনতে পেল, "আফা! আফা! দুই টেকী আফা!"

ইভা মাথা ঘুরিয়ে জালালকে দেখতে পায়। তার হাতে মুঠি করে ধরে রাখা অনেকগুলো নানা ধরনের নোট। জালাল ইভার দিকে হাতটা বাড়িয়ে বলল, "আফা, আপনের ভাংতি টাকা।"

ইভা টাকাগুলো নিল, অনেকগুলো ময়লা নোট, তার ভেতর থেকে দুই টাকার একটা নোট বের করে জালালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও।"

জালাল নোটটা হাতে নিয়ে বলল, "আসলে আফা আপনারে খুঁইজা পাইছিলাম না। প্লাটফর্ম বদলি হইছে তো।"

ইভা জালালের চোখের দিকে তাকাতেই চোখটা নামিয়ে নিয়ে নিচু গলায় বলল, "আমারে কেউ একশ টাকার ভাংতি দিতেও চায় না, হেই জন্যে—"

ইভা নরম গলায় বলল, "আমার দিকে তাকাও।"

জালাল ইভার দিকে তাকাল। ইভা বলল, "সত্যি করে বল দেখি কী হয়েছে?"

জালাল ইভার চোখের দিকে তাকাল। সেই চোখে কোনো রাগ নেই, অভিযোগ নেই। হঠাৎ করে জালাল বুঝতে পারে এই আপাকে সত্যি কথাটি বলা যায়। সে অপরাধীর মতো বলল, "আসলে আমি আপনার টাকা নিয়া ভাইগা গেছিলাম।"

"তারপর?"

"তারপর মনে হইল কামটা ঠিক হয় নাই। অন্যের লগে করা ঠিক আছে—আপনার লগে করা ঠিক হয় নাই।"

ইভা জালালের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "নাম কী তোমার?"

"জালাল।"

"ভেরিগুড জালাল। যাও।"

"আফনে উঠেন আফা, আমি আফনার ব্যাগটা তুইলা দেই। টেরেন ছাইড়া দিব।"

ইভা ওঠার পর জালাল ইভার হাতে ব্যাগটা তুলে দিল।

ট্রেন ছেড়ে দেবার পর যখন সেটা মোটামুটি স্পিড নিয়েছে, শহরের ঘিঞ্জি অংশটুকু পার হয়ে গ্রাম, ধানক্ষেত, গরু, রাখাল, নদী নৌকা এসব দেখা যাচ্ছে তখন ইভা শুনতে পেল কেউ একজন তাকে ডাকছে। মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখল কানাডার প্রফেসর।

ইভা কিছু বলার আগেই এনথ্রোপলজির প্রফেসর বলল, "আমি দেখেছি। দূর থেকে পুরো ব্যাপারটা দেখেছি।"

ইভা কিছু বলল না। মানুষটি বলল, "আমি হেরে গেলাম, কিন্তু আপনি একটা জিনিস জানেন?"

"কী?"

"আমি যদি টাকাটা দিতাম তাহলে মনে হয় ছেলেটা কোনোদিন ফিরে আসত না। সে ফিরে এসেছে কারণ টাকাটা দিয়েছেন আপনি।"

ইভা এবারেও কোনো কথা বলল না।

কানাডার প্রফেসর বলল, "আমি মানুষটা একটু গাধা টাইপের। সেইজন্যে আপনার সাথে কম্পিটিশন করতে গিয়েছিলাম! আমার উচিত শিক্ষা হয়েছে।"

ইভা বলল, "আসলে—" বলে থেমে গেল।

মানুষটা বলল, "আসলে কী?"

"মানুষের ভালো মন্দ নিয়ে মনে হয় কম্পিটিশন করতে হয় না। মানুষকে মনে হয় বিচার করতে হয় না। যখন যে যেভাবে আসে তাকে মনে হয় সেভাবে নিতে হয়। আমি তাই নেই।"

কানাডার প্রফেসরকে কেমন জানি বিমর্ষ দেখায়, সে অন্যমনস্কের মতো মাথা নাড়ল। তার এতোদিনের হাইপোথিসিসে গোলমাল হয়ে গেছে—মানুষটার মনে হয় একটা সমস্যা হয়ে গেল। ইভার মনে হলো : আহা বেচারা!

৩.

সবুজকে দেখে জালাল অবাক হয়ে বলল, "ভাই, তুমি?"

সবুজ তার ময়লা দাঁত বের করে হেসে বলল, "হ। আমি।"

জালাল অবাক হয়ে সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকে দেখে চেনাই যায় না। একটা জিন্সের প্যান্ট, বুকের মাঝে ইংরেজি কথাবার্তা লেখা একটা টি শার্ট পায়ে টেনিস সু। পকেটে সিগারেটের প্যাকেট। জালাল বলল, "ভাই তুমারে দেইখা তো চিনাই যায় না!"

সবুজ কথার উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা লাল রুমাল বের করে ঘাড় মুছল তারপর মুখে একটা তাচ্ছিল্য টাইপের হাসি ফুটিয়ে বলল, "না চিনার কী আছে? আমার কী মাথার মাঝে শিং গজাইছে যে চিনবি না?"

সবুজ এই কয়দিন আগেও স্টেশনে তাদের একজন ছিল। ট্রেন এলে দৌড়ে ট্রেনে উঠত, ব্যাগ নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি করত, আবর্জনা জঞ্জাল ঘেটে নানা ধরনের জিনিসপত্র বের করত—দরকার হলে একটু চুরি চামারি একটু ভিক্ষা করত। রাত্রিবেলা সবার সাথে প্লাটফর্মে ঘুমাত। মাঝখানে হঠাৎ সে উধাও হয়ে গেল। কোথায় গেছে কেউ জানে না—এটা অবশ্যি নতুন কিছু না স্টেশনে যারা থাকে তাদের যাবার কোনো জায়গা নেই তাই সব জায়গাই তাদের জায়গা। কেউ স্টেশনে কিছুদিন থেকে হয়তো বাজারে থাকা শুরু করল, বাজার থেকে হয়তো মাজারে, মাজার থেকে হয়তো স্টেডিয়ামে! একবার পথে ঘাটে থাকা অভ্যাস হয়ে গেলে তখন কোথাও আর থাকার সমস্যা হয় না। তাই স্টেশনে যারা থাকে তারা যে সবসময়েই স্টেশনে থাকে তা নয়—তারা যায় আসে। সেজন্যে সবুজ যখন হঠাৎ উধাও হয়ে গেল অন্যেরা এমন কিছু অবাক হয়নি। সবুজের বয়স তেরো-চৌদ্দ এর কাছাকাছি, জালালের কাছাকাছি বয়সের ছেলেমেয়ে থেকে একটু বেশি তাই তাদের সাথে যোগাযোগটা ছিল একটু কম। সবুজের ওঠা বসা ছিল একটু বড়দের সাথে যারা

একটু মাস্তান টাইপের, যারা মুখ খারাপ করে গালাগাল করতে পারে, যারা ধুমসে বিড়ি সিগারেট খায় তাদের সাথে। তারপরেও এক স্টেশনে এক প্লাটফর্মে যারা ঘুমায় তাদের মাঝে একটা সম্পর্ক থাকে।

জালাল বলল, "ভাই, কই থাক এখন?"

সবুজ সরাসরি উত্তর না দিয়ে ঘাড় নাড়াল, চোখ নাচাল যেটার মানে যা কিছু হতে পারে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। সেখান থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগিয়ে খুব কায়দা করে সেটাকে ধরাল। তারপর একটা টান দিয়ে খক খক করে কাশতে লাগল—বোঝাই যাচ্ছে সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারটা সে এখনো শিখতে পারে নাই তাই কায়দা কানুনটাই হচ্ছে এখন আসল ব্যাপার।

সবুজ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "তরার খবর কী?"

"ভালা।"

"রোজগারপাতি কী রকম?"

"বেশি ভালা না। কুনো পাবলিক টেহা পয়সা দিবার চায় না।"

সবুজ বড় মানুষের মতো হা হা করে হাসল, হাসিটা অবশ্যি শুনতে ঠিক আসল হাসির মতো শুনাল না। মনে হলো হাসিটাতে ভেজাল আছে। জালাল জিজ্ঞেস করল, "হাস ক্যান?"

"হাসুম না? তুই ছাগলের মতো কথা কইবি আর আমি হাসুম না? পাবলিক কি তোর সমুন্দী লাগে যে তরে টেহা পয়সা দিব?"

"তয় তুমি এতো টেহা পয়সা কই পাও?"

সবুজ রহস্যের মতো ভঙ্গি করে বলল, "পাবলিক কুনো দিন টেহা পয়সা দেয় না। পাবলিক হইল কিরপনের যম। কিন্তুক বাতাসের মাঝে টেহা উড়ে, তুই যদি জানস তা হইলে তুই সেই টাকা ধরবি আর পকেটে ঢুকাবি!"

জালাল বিষয়টা ঠিক বুঝল না, ভুরু কুঁচকে বলল, "বাতাসে টেহা উড়ে?"

"হ।"

"তুমি হেই টেহা ধর আর পকেটে ঢুকাও?"

সবুজ মাথা নাড়ল। জালাল বলল, "আমারে দেহাও টেহা কোনখানে উড়ে আমিও ঢুকাই।"

"দেখবার চাস?"

জালাল মাথা নাড়ল, বলল, "হ।"

"ঠিক আছে তুই যদি দেখবার চাস তা হইলে তোরে দেখামু। তোরে শিখামু কিন্তুক তুই সেইটা কাউরে কইতে পারবি না।"

জালাল মাথা নাড়ল, বলল, "কমু না।"

"খোদার কসম?"

"খোদার কসম।"

"আল্লাহ্‌র কীরা?"

"আল্লাহ্‌র কীরা।"

কেমন করে বাতাসে উড়তে থাকা টাকা ধরতে হয় সবুজ তখনই সেটা বলতে শুরু করতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক তখন মায়া আর জেবা এসে হাজির হলো বলে বলতে পারল না। জেবা অবাক হয়ে বলল, "সবুজ বাই! তুমারে দেহি ইস্কুলের ছাত্রের মতো লাগে!"

মায়া চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল তারপর সাবধানে সবুজের সার্টটা হাত দিয়ে ছুয়ে বলল, "লতুন সার্ট!"

সবুজ মায়ার হাত সরিয়ে বলল, "হাত সরা, ময়লা হাত দিয়া ধরবি না।"

জেবা হি হি করে হেসে বলল, "লতুন বড়লোক।"

সবুজ চোখ পাকিয়ে বলল, "ঢং করবি না।"

জেবা ছোট বড় মানে না, হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, "বাই, ইস্কুল ছাত্রের কাপড় কোন বাড়ি থাইকা চুরি করছ?"

"চুরি করমু কেন? কিনছি।"

"কিনতে তো টেহা লাগে। তুমার টেহা আছে?"

"তুই কী মনে করস? আমার টেহা নাই?"

জেবা মাথা নাড়ল, বলল, "থাকনের কথা না!"

সবুজ তখন প্যান্টের পিছন থেকে একটা মানি ব্যাগ বের করে জেবাকে খুলে দেখাল, ভেতরে অনেকগুলো নোট। জেবা মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝছি।"

"কী বুঝছস?"

"তুমি পকেট মাইরের ইস্কুলে ভর্তি হইছ। তুমি মাইনসের পকেট মার।"

"মারলে মারি। তোর সমিস্যা কী?"

"আমার কোনো সমিস্যা নাই। সমিস্যা তোমার। যেদিন ধরা খাইবা সেইদিন তোমারে পিটায়া মাইরা ফেলব। সাপরে যেইরকম মাইনসে পিটায়া মারে হেইভাবে।"

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তাদের সবার চোখের সামনে কয়েক মাস আগে এই স্টেশনে একজন পকেটমারকে পাবলিক পিটিয়ে শেষ করে

দিয়েছিল। পুলিশ এসে কোনোভাবে পকেটমারটাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে, মানুষটা বেঁচে গেছে না মরে গেছে তারা জানে না।

সবুজ মুখ শক্ত করে বলল, "আমি পকেট মারি না।"

"তয় মানি ব্যাগ কই পাইছ।"

"কিনছি।"

"টেহা কই পাইছ?"

"রোজগার করছি।"

"কেমনে? তুমি কী জজ-বেরিস্টরের চাকরি কর?" কথা শেষ করে জেবা হি হি করে হাসতে থাকে।

সবুজ চোখ পাকিয়ে জেবার দিকে তাকিয়ে তাকে একটা খারাপ গালি দিল। জেবা গালিটা গায়ে মাখল না, মায়াকে বলল, "আয় মায়া যাই।"

মায়া সবুজের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমার এতো টেহা। আমরারে বিরানী খাওয়াও।"

সবুজ বলল, "যা ভাগ।"

"তাহইলে ঝাল মুড়ি খাওয়াও।"

"ভাগ। না হইলে মাইর দিমু।"

মায়া জিব বের করে সবুজকে একটা ভেংচি দিয়ে হেঁটে চলে গেল। সবুজ তার সিগারেটে আরো একটা টান দিয়ে আরেকবার কেশে ওঠে সিগারেটটা জালালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নে। খা।"

জালাল মাথা নাড়ল, বলল, "নাহ্।"

সবুজ তখন শুকনো মুখে সিগারেটটা হাতে নিয়ে অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে আবার সিগারেটটাতে টান দেয়।

জালাল বলল, "বাই। তুমি টেহা উড়ার কথা বইলতে চাইছিলে।"

সবুজ গম্ভীর মুখে বলল, "কমু। কিন্তুক সাবধান।"

"ঠিক আছে। সাবধান।"

সবুজ আকাশে টাকা উড়ার বিষয়টা জালালকে বলল দুইদিন পর। সেটা বলার জন্যে জালালকে অবশ্যি সবুজের পিছন পিছন রেল লাইন ধরে অনেক দূর হেঁটে যেতে হলো। শহরের বাইরে একটা নিরিবিলি জায়গায় কালভার্টের উপর বসে সবুজ বিষয়টা জালালকে বোঝাল। শহরে হেরোইন ব্যবসায়ি আছে, সবুজ তাদের হেরোইন আনা নেয়ার কাজে সাহায্য করে—এই কাজে অনেক টাকা।

জালাল জানতে চাইল, কেমন করে আনা নেয়া করে, মাথায় করে নাকি ঠেলা গাড়ি করে? শুনে সবুজ হি হি করে হাসল, বলল, হেরোইন সোনা থেকে

দামি, একটা ছোট প্লাস্টিকের ব্যাগে পাঁচ দশ লাখ টাকার হেরোইন থাকে। স্কুলের ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে যায়, ছোট মানুষ বলে কেউ সন্দেহ করে না। ঠিক ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিলেই নগদ টাকা। জালাল জানতে চাইল হেরোইন দেখতে কী রকম, সবুজ জানাল দেখতে সাদা রংয়ের দেখে মনে হয় গুড়া সাবান। জালাল জানতে চাইল হেরোইন কেমন করে খায়। সবুজ তখন কেমন করে মানুষ হেরোইন নেয় সেটা অভিনয় করে দেখাল। জালাল তখন জানতে চাইল মানুষ কেন হেরোইন খায়, সবুজ তখন বলল নেশা করার জন্যে। জালাল তখন জানতে চাইল সবুজ কখনো হেরোইন খেয়েছে কী না। সবুজ তখন হঠাৎ রেগে ওঠে বলল সে কেন হেরোইন খাবে? সে কী হেরোইনখোর? জালাল তখন আর কোনো প্রশ্ন করল না।

সবুজ তখন তার সিগারেটের প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বের করে সেটা ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিল আর জালাল তখন একটু অবাক হয়ে দেখল সবুজ আগের মতো কেশে উঠল না। সবুজ কালভার্টের উপর থেকে নিচের খালে থুতু ফেলে বলল, "তোরে আসলে এখনো আসল কথাটা কই নাই।"

"কী কথা?"

"কাউরে কইবি না তো?"

জালাল মাথা নাড়ল, "কমু না।"

সবুজ তখন জালালকে দিয়ে নানা রকম কীরা কসম কাটিয়ে নিল, তারপর বলল, "আমি যখন হেরোইন আনা নেওয়া করি তখন হেরোইনের প্যাকেট থেকে এক চিমটি হেরোইন সরায়া রাখি—কেউ টের পায় না। এই রকম ভাবে আস্তে আস্তে যখন একটু বেশি হবি তখন আমি নিজে হেরোইনের ব্যবসা শুরু করুম।"

"তুমি নিজে শুরু করবা?"

"হ্যাঁ।"

"কার কাছে বেচবা?"

"পাবলিকের কাছে। হেরোইনখোরের কাছে।"

জালাল অবাক হয়ে সবুজের দিকে তাকিয়ে রইল। তারা যখন স্টেশনের প্লাটফর্মে ঘুমায় তখন তাদের সবচেয়ে বড় বড় বিপদ দুই জায়গা থেকে আসে, এক হচ্ছে পুলিশ আর দুই হচ্ছে হেরোইনখোর। যখনই তারা ক্ষ্যাপা কোনো মানুষ দেখে ধরেই নেয় সেই মানুষগুলো হচ্ছে হেরোইনখোর। সবুজ সেই হেরোইনখোরদের কাছে হেরোইনের ব্যবসা করবে শুনে জালালের হাত-পা কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সবুজ তার সিগারেটে টান দিয়ে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "বুঝলি জালাইল্যা, হেরোইন হইল গিয়া সোনার থেকে দামি—এই মনে কর এক কাপ হেরোইনের পাইকারী দাম হচ্ছে কম পক্ষে পাঁচ লাখ টাকা। খুচরা আরো বেশি।"

"তোমার কাছে কয় কাপ আছে?"

সবুজ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সিগারেটে আবার টান দিল। বলল, "তুই করবি বিজনেস?"

"ভাই, ডর করে।"

"ডরের কী আছে। আমি আছি না। তুই পয়লা আমার সাথে থাকবি তারপরে নিজে নিজে করবি।"

জালাল কিছু বলল না, হেরোইনখোরদের নিয়ে সে যত ভয়ংকর গল্প শুনেছে সেগুলো জেনে শুনে তার এই বিজনেসে যাবার কোনো ইচ্ছা নেই। কিন্তু সবুজকে সেটা বলতেও তার সাহস হলো না। তাকে বিশ্বাস করে সবুজ সব কথা বলেছে এখন সেখান থেকে পিছিয়ে যাওয়া রীতিমতো বিশ্বাসঘাতকের কাজ হবে।

সবুজ আবার কয়েকদিনের জন্যে উধাও হয়ে গেল। কয়েকদিন পর আবার যখন স্টেশনে ফিরে এসেছে তখন তার চেহারা আরো খোলতাই হয়েছে। টি সার্টের উপর গোলাপি একটা সার্ট, শুধু তাই না, বাম হাতে একটা ঘড়ি। এবারে অবশ্যি সবুজকে আগেরবারের মতো নিজেকে জাহির করতে দেখা গেল না, কথাবার্তা বলল কম আর তাকে কেমন জানি চিন্তিত দেখাল।

জালাল একদিন সবুজকে আবিষ্কার করল গোডাউনের পিছনে। এমনিতে সেখানে কেউ যায় না, জায়গাটা নির্জন একটু অন্ধকার। জালাল যখন মাঝে মাঝে তার গোপন টাকা গুনতে চায় এখানে এসে গুনে যেন কেউ দেখতে না পায়। সেখানে সবুজকে দেখে জালাল যেরকম চমকে উঠল, জালালকে দেখে সবুজও সেরকম ভাবে চমকে উঠল। সবুজ জালালকে ধমক দিয়ে বলল, "কী করস এইখানে?"

জালালের মনে হলো সেও সবুজকে একই প্রশ্ন করতে পারে কিন্তু সাহস করল না। আমতা আমতা করে বলল। "সকাল বেলা ডাইলপুরি খাইছিলাম, বাসি মনে হয়। পেটের মাঝে মোচড় দিছে তাই এইখানে আসছিলাম ইয়ে করতে—"

খুবই বিশ্বাসযোগ্য কথা, নিরিবিলি জায়গা বলে অনেকেই এখানে "ইয়ে" করতে আসে, সবসময়েই এখানে চাপা দুর্গন্ধ। সবুজ জালালের কথা বিশ্বাস করল তখন জালাল জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী কর এইখানে?"

"এই তো—" বলে হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে সবুজ হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে একবার পিছন ফিরে দেখল তারপর গোডাউনের পিছন থেকে বের হয়ে গেল। জালাল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর তার প্যান্টের শেলাইটা খুলে সেখান থেকে তার দুমড়ানো মোচড়ানো নোটগুলো বের করে গুনতে শুরু করে।

রাত্রি বেলা সবাই দুই নম্বর প্লাটফর্মে শুয়েছে। এখন কোন মাস কে জানে একটু একটু শীত পড়তে শুরু করেছে। সারাদিন দৌড়াদৌড়ির মাঝে থাকে তাই শোয়ার সাথে সাথে সবার চোখ বন্ধ হয়ে আসে। জালাল ঘুমিয়েই ছিল হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল, কুক্কু তার কাপড় কামড়ে ধরে তাকে টানছে।

জালাল চোখ খুলতেই কুক্কু চাপা স্বরে ডাকল, কেমন যেন ভয়ার্ত একটা ডাক, লেজটা নোয়ানো কান দুটো পিছনে, দেখে মনে হয় কিছু একটা দেখে কুক্কু ভয় পেয়েছে। জালাল ঘুম ঘুম চোখে কুক্কুকে কাছে টেনে এনে পাশে শুইয়ে দেয়ার চেষ্টা করল, কুক্কু শু'তে চাইল না, চাপাস্বরে গরগর করে শব্দ করল তারপর লেজ নামিয়ে জালালের চারপাশে হাঁটতে থাকে, পা দিয়ে মাটি আচড়ায়। জালাল বুঝতে পারল কুক্কু তাকে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করছে, কিন্তু মানুষের মতো কথা বলতে পারে না বলে বলতে পারছে না। জালাল ওঠে বসে বলল, "কী হইছে?"

কুক্কু কয়েক পা হেঁটে গেল তারপর দূরে তাকিয়ে থেকে মাথা উঁচু করে ঘেউ ঘেউ করে ডাকল। তারপর হঠাৎ করে মাথা নামিয়ে জালালের কাছে ফিরে এল। আকারে ইঙ্গিতে আবার কিছু বলার চেষ্টা করছে। জালাল মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করল, "গুলমাল?"

কুক্কু মাথা নেড়ে কুঁই কুঁই শব্দ করল, যার অর্থ যা কিছু হতে পারে। জালাল বলল, "আমি যামু তোর লগে?"

কুক্কু আবার মাথা নিচু করে চাপা ভয়ের শব্দ করল। জালাল তখন হাল ছেড়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। কুক্কু কিছু একটা বলতে চাইছে, ব্যাপারটা মনে হয় খারাপ কিন্তু তার আর কিছু করার নেই। ব্যাপারটা কী হতে পারে চিন্তা করতে করতে জালাল ঘুমিয়ে গেল। কুক্কু অবশ্যি ঘুমাল না। দুই পায়ের মাঝখানে মাথা রেখে বসে রইল। একটু পর পর চাপা স্বরে ভয়ার্ত একটা শব্দ করতে লাগল।

ভোরে মায়ার চিৎকারে জালালের ঘুম ভেঙে গেল, মায়া রেল লাইন ধরে ছুটতে ছুটতে আসছে, তার চোখে মুখে অবর্ণনীয় আতংক। তার ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বাতাস বের করে চিৎকার করতে করতে আসছে, কী বলছে কেউ বুঝতে পারছে না। সে ভয়ে ঠিক করে কথা বলতেও পারছিল না, আতংকের এক ধরনের শব্দ ছাড়া মুখ থেকে আর কিছু বের হচ্ছে না। জেবা ছুটে গিয়ে মায়াকে ধরে জিজ্ঞেস করল, "কী হইছে?"

মায়া কথা না বলে থরথর করে কাঁপতে থাকে। জেবা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "কী হইছে?"

"মাইরা ফালাইছে।"

"মাইরা ফালাইছে? কে মাইরা ফালাইছে? কারে মাইরা ফালাইছে।"

"সবুজ ভাইরে।" বলে মায়া হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকে।

কুক্কু দাঁড়িয়ে জালালের দিকে তাকিয়ে দুইবার ডাকল, জালালের মনে হলো কুক্কু স্পষ্ট করে বলল, "আমি তোমারে রাত্রেই বলছিলাম। আমার কথা তুমি বিশ্বাস করলা না।"

প্লাটফর্মে শুয়ে থাকা অনেকে তখন ওঠে রেল লাইন ধরে দৌড়াতে থাকে। আউটার সিগনালের কাছে একটা ছোট ঝোপের পাশে সবুজ পড়ে আছে। তার জিন্সের প্যান্ট, লাল সার্ট, টেনিস সু এমন কী হাতের ঘড়িটাও আছে। সবুজের পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় যে সে বেঁচে নেই।

জালাল ভয়ে ভয়ে একটু কাছে যায়, ঠোঁটের কোনায় একটু রক্ত শুকিয়ে আছে। চোখগুলো আধখোলা। সেই আধখোলা চোখে কোনো প্রাণ নেই—কী ভয়ংকর সেই প্রাণহীন দৃষ্টি! কুক্কু কাছে গিয়ে সবুজকে শুঁকলো তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে একবার ডাকল। এছাড়া আর কেউ কোনো কথা বলল না।

সবাই একটু দূরে মাটিতে চুপচাপ বসে থাকে। কী করবে তারা কেউ বুঝতে পারছে না। আস্তে আস্তে একজন দুইজন বড় মানুষ এসে হাজির হতে থাকে, চাপা গলায় নিজেদের ভেতর কথা বলছে। কী হয়েছে কেন সবুজকে মেরে ফেলেছে কেউ বুঝতে পারছে না। শুধু জালাল জানে কী হয়েছে, কিন্তু সে কাউকে এটা বলতে পারবে না। হেরোইন ব্যবসায়িরা সবুজের ব্যবসার কথা টের পেয়ে গেছে। সবুজের খুব তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়ার ইচ্ছা ছিল, এই রকম ইচ্ছা মনে হয় খুবই ভয়ংকর। তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়া যদি এতো

সোজা হতো তাহলে মনে হয় সবাই বড়লোক হয়ে যেত। সেইজন্যে মনে হয় পৃথিবীতে বড় লোক মানুষ বেশি নাই, সেইজন্যেই মনে হয় অনেক মানুষকে প্লাটফর্মে ঘুমাতে হয়।

পুলিশের লোক এসে চাটাই দিয়ে মুড়িয়ে সবুজের শরীরটা না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত জালাল, জেবা, মায়া, মজিদ তারা সবাই সেখানে বসে থাকে। আন্তঃনগর জয়ন্তিকা এসে গেল আবার চলেও গেল, আজকে কেউ সেই ট্রেনে গিয়ে ছোটাছুটি করল না।

দুপুরের দিকে মজিদ খবর আনল বিকাল বেলা সবুজের লাশ কাটাকুটি করার জন্যে লাশ কাটা ঘরে আনবে। মায়া চোখ কপালে তুলে বলল, "ক্যান? লাশ কাটাকুটি করবি ক্যান?"

মজিদ গম্ভীর হয়ে বলল, "মার্ডার হলি লাশ কাটতি হয়। দেখতি হয় কেমনি মার্ডার হলো।"

একদিন আগেই যে পুরোপুরি একজন মানুষ ছিল এখন সে শুধু যে সে একটা লাশ তাই নয়—সেই লাশ আবার কাটাকুটি করা হবে চিন্তা করেই সবাই কেমন জানি মন মরা হয়ে যায়।

মজিদ বলল, "বেওয়ারিশ লাশ। মনে অয় হাসপাতালে বিক্রি করি দিবি।"

মায়া জিজ্ঞেস করল, "বেওয়ারিশ কী?"

জেবা বলল, "যেই লাশের কুনো মালিক নাই সেই লাশ হইল বেওয়ারিশ।"

"লাশের মালিক ক্যামনি অয়?"

"মা বাপ ভাই বুন হইল মালিক। যার মা বাবা ভাই বুন নাই, তার লাশের কুনো মালিক নাই।"

মায়া চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থাকে, এই স্টেশনে যারা থাকে তাদের কারোই মা বাবা ভাই বোন নাই, থাকলেও তাদের খোঁজ নাই। তার মানে তার চারপাশে যারা আছে তারা সবাই বেওয়ারিশ?

জালাল মজিদকে জিজ্ঞেস করল, "লাশ কাটা ঘরে যাবি?"

মজিদ প্রথমে একটু অবাক হলো তারপর মাথা নেড়ে বলল, "যামু।"

জেবা বলল, "আমিও যামু।"

মায়া বলল, "আমিও।"

কিছুক্ষণের মাঝেই স্টেশনের বাচ্চাদের ছোট একটা দল লাশকাটা ঘরের দিকে রওনা দিল। দলটার সামনে কুক্কু এবং কুক্কুর ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হল সে খুব ভালো করে জানে কোথায় যেতে হবে এবং সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সবার একটা ধারণা ছিল যে লাশকাটা ঘরটা হবে ফাঁকা একটা মাঠের মাঝখানে ঝোপঝাড় গাছপালা দিয়ে ঢাকা ছোট একটা অন্ধকার ঘর। কিন্তু খোঁজ খবর নিয়ে তারা যে জায়গায় হাজির হলো সেটা ঘর সরকারি হাসপাতাল। সাদা রংয়ের একটা বিল্ডিংয়ের এক পাশে একটা একতালা বিল্ডিং নাকি লাশকাটা ঘর। আশপাশে আরো বিল্ডিং, সেখানে মানুষ জন যাচ্ছে আসছে দেখে মনেই হয় না এইখানে একটা লাশকাটা ঘর থাকতে পারে। বিল্ডিংয়ের সামনে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, জালাল সাহস করে পুলিশটাকে জিজ্ঞেস করল, "এইখানে কী আমাগো সবুজের লাশ কাটব?"

পুলিশটা ভালো করে তার কথা শুনলই না, খেকিয়ে ওঠে বলল, "যা বদমাইশের বাচ্চা। ভাগ।"

কুক্কু কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সেটা পুলিশের দিকে তাকিয়ে রাগি রাগি গলায় চাপা একটা শব্দ করল, সেটা শুনে মনে হয় পুলিশটাও একটু ভয় পেল। তখন জেবা এগিয়ে এসে ক্যাট ক্যাটে গলায় বলল, "আফনেরে একটা জিনিস জিগাই তার উত্তর দেন না কিল্লাই। আমাগো ভাই মরছে আমাগো দুঃখু অয় না?"

পুলিশটা কিছুক্ষণ জেবার দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল, "কি জিজ্ঞেস করলি?"

জালাল বলল, "সবুজ ভাইয়ের লাশ এইখানে কাটব?"

পুলিশ ভুরু কুঁচকিয়ে বলল, "স্টেশনে যেটা মার্ডার হয়েছে?"

"জে।"

"তার নাম সবুজ? তোরা চিনিস?"

"জে।"

"কেমন করে মারা গেছে তোরা জানিস?"

সবাই মাথা নেড়ে বলল তারা জানে না। পুলিশটার তখন তাদের নিয়ে সব কৌতূহল শেষ হয়ে গেল। সে খুব যত্ন করে নাকের একটা লোম ছিড়ে বলল, "হ্যাঁ। ছেলেটার এইখানে পোস্ট মর্টেম হচ্ছে।"

ওরা পোস্ট মর্টেম বলে এই ইংরেজি শব্দটা আগে কখনো শুনেনি কিন্তু বুঝে গেল এটার মানে হচ্ছে লাশ কাটা। মায়া হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বলল, "সবুজ ভাইয়ের লাশরে কয় টুকরা করব?"

পুলিশটা একটু অবাক হয়ে মায়ার দিকে তাকাল, তারপর নরম গলায় বলল, "ধুর বোকা মেয়ে! এই একটু খানি কাটবে তারপর আবার সেলাই করে দিবে। দেখে বোঝাই যাবে না।"

মায়া কী বুঝল কে জানে, ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। জেবা তখন মায়াকে ধরে সরিয়ে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। মায়া একটু শান্ত হওয়ার পর ওরা সবাই মিলে বিল্ডিংটার পাশে দেওয়ালে হেলান দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। কেন বসে আছে কেউ জানে না।

কুক্কু বেশ উত্তেজিত হয়ে আশপাশে ঘুরতে থাকে। তাকে দেখে বোঝা যায় কোনো একটা কারণে সে এই জায়গাটাকে মোটেই পছন্দ করতে পারছে না। সারাক্ষণ এদিক সেদিক তাকাচ্ছে একটু পরপর চাপা গলায় গরগর করছে, হঠাৎ হঠাৎ ওঠে দাঁড়িয়ে রাগি চোখে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে। জালাল কুক্কুকে ধরেও থামিয়ে রাখতে পারে না, কী হয়েছে কে জানে।

বেশ খানিকক্ষণ পর লাশ কাটা ঘরের কলাপসিবল গেট খুলে একজন মানুষ বের হয়ে পুলিশটাকে কী যেন বলল, পুলিশটা তখন পকেট থেকে কিছু কাগজ বের করে হাতে নিয়ে ক্লাশ কাটা ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। একটু পর সে বের হয়ে মোবাইলে কথা বলতে বলতে হেঁটে জানি কোথায় চলে গেল।

বাচ্চাগুলো কী করবে বুঝতে পারল না। তারা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, ঘরটার ভেতরে ঢুকবে কীনা বুঝতে পারছিল না। একটু এগিয়ে গিয়ে তারা কলাপসিবল গেটের সামনে দাঁড়ায়।

ঠিক তখন একটা মোটর সাইকেল বিকট শব্দ করে লাশ কাটা ঘরের সামনে এসে থামে। ঠিক কী কারণ জানা নেই মানুষ দুইজনকে দেখেই জালালের বুকটা ধক করে ওঠে। মানুষ দুইজনের বয়স বেশি না, একজন শ্যামলা অন্যজন অসম্ভব ফরসা। শ্যামলা মানুষটা মোটর সাইকেল চালাচ্ছিল, সে বসেই রইল। ফরসা মানুষটা মোটরসাইকেল থেকে নেমে এদিক-সেদিক তাকায়, বাচ্চাদের দিকে চোখ পড়তেই সে লম্বা পায়ে তাদের দিকে আসতে থাকে। জালাল দেখল ফরসা মানুষটার লালচে রংয়ের চুল, চুল ছোট করে ছাটা। চোখে কালো চশমা। হাতে একটা চাবির রিং সেটা ঘুরাতে ঘুরাতে ফর্সা মানুষটা ওদের দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "তোরা কী স্টেশনের লাফাংরা?"

লাফাংরা শব্দটার মানে কী কেউ জানে না কিন্তু তারা ধরেই নিল শব্দটা দিয়ে তাদেরকেই বোঝানো হচ্ছে। তাই তারা সবাই ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল।

"হারামির বাচ্চা সবুজরে তোরা চিনিস?"

জালাল চমকে ওঠে। গতরাতে যাকে মেরে ফেলা হয়েছে তাকে আজকে বিকেলে হারামির বাচ্চা ডাকার মাঝে এক ধরনের ভয়ের ব্যাপার আছে। সেটা সবাই টের পেয়ে গেল, তাই কেউ কোনো কথা বলল না। মানুষটা ধমকে উঠল, "কথা বলিস না কেন?"

জালাল বলল, "জে চিনি।"

"তোদের কারো কাছে সবুজ কিছু দিয়ে গেছে?"

জিনিসটা কী হতে পারে জালাল সাথে সাথে অনুমান করে ফেলে। অন্যরা কিছু বুঝল না। জেবা জিজ্ঞেস করল, "কী দিয়া যাইব?"

"একটা প্যাকেট। প্লাস্টিকের প্যাকেট। ভেতরে সাদা গুড়া। সাবানের গুড়ার মতো।"

একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করল, জালাল ছাড়া আর কেউ কিছু বুঝতে পারল না। তাই জালাল মাথা নেড়ে বলল, "না।"

মানুষটা এবারে ছোট একটা গর্জন করে ওঠে বলল, "ঠিক করে বল।" এবারে জেবা বলল, "ঠিক কইরাই কইতাছি। আমাগো কেউ কিছু দেয় নাই।"

"তাহলে সবুজের সাথে তোদের এতো খাতির কেন?"

"আমরা হগলে এক সাথে থাকতাম হেই জন্যে খাতির।"

"সবুজ তোদের সাথে কী নিয়ে কথা বলত?"

এবারে সবাই চুপ করে রইল, সবুজ কী নিয়ে কথা বলত সেটা আলাদা করে কেউ মনে করতে পারল না। এটা কী রকম প্রশ্ন সেটা নিয়েই সবাই একটু চিন্তার মাঝে পড়ে যায়। শুধু জালাল আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারে আর বুক ধক ধক করতে থাকে।

"তোদের মাঝে জালাল কার নাম?"

জালাল ভীষণভাবে চমকে উঠল, শুকনো মুখে বলল, "আমি।"

একেবারে কাগজের মতো ফর্সা মানুষটা এইবারে জালালের মুখের কাছাকাছি নিজের মুখটা নামিয়ে আনে, তারপর হিস হিস করে বলে, "আমি খবর পেয়েছি সবুজ তোর সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলেছে। কী নিয়ে কথা বলেছে?"

জালাল একটা জিনিস বুঝে গেল, তাকে কিছুতেই সত্যি কথাটি বলা যাবে না আর সে যে কথাটি বলবে সেই কথাটি এই মানুষগুলো বিশ্বাস করে কী না তার উপর নির্ভর করবে সে কী বেঁচে থাকবে নাকি তাকেও সবুজের মতো মেরে ফেলবে। পথে ঘাটে বেঁচে থাকার জন্যে তারা হাজার রকম মিথ্যা কথা বলে কিন্তু আজকের মিথ্যা কথাটা হতে হবে একেবারে অন্যরকম।

মানুষটা হুংকার দিল, "বল, কী নিয়ে কথা বলে?"

"টেহা পয়সা নিয়া। তার কতো টেহা পয়সা হে কতো আরামে থাকে হেই সকল কথা কইতো।"

ফর্সা মানুষটা চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে তার মুখটা জালালের মুখের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসে। মুখটা এতো কাছ এনেছে যে জালাল তার চোখের সাদা জায়গায় চোখের শিরাগুলো পর্যন্ত দেখতে পায়। সেগুলো লাল হয়ে ফুলে আছে মনে হয় এক্ষুণি ফেটে রক্ত বের হয়ে আসবে। মানুষটা হিংস্র গলায় বলল, "সবুজ কেমন করে টাকা কামাই করতো?"

জালাল একটা নিঃশ্বাস ফেলে প্রথম সত্যিকারের মিথ্যা কথাটা বলল, "আমি তারে অনেকবার জিগাইছি হে কইতে রাজি হয় নাই।"

"রাজি হয় নাই?"

"না।"

"কী বলেছে?"

জালাল প্রথম মিথ্যাটাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে দ্বিতীয় মিথ্যা কথাটা বলল, "হে কইছে তারে পাঁচ শ টেহা দিলে কইবে।"

"পাঁচ শ টাকা?"

"হ।"

হঠাৎ করে কিছু বোঝার আগে ফর্সা মানুষটা খপ করে জালালের বুকের কাছে সার্টটা খামচে ধরে তার গালে প্রচণ্ড জোরে একটা থাবা দিয়ে তাকে হ্যাচকা টানে উপরে তুলে বলল, "তুই আমার সাথে রংবাজি করিস?"

মানুষটা কথা শেষ করতে পারল না তার আগেই একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেল। কুক্কু এতোক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে পুরো ঘটনাটি দেখছিল, জালাল সারাক্ষণ তার চাপা গরগর শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। ফর্সা মানুষটা জালালের মুখে মেরে বসার সাথে সাথে কুক্কু গর্জন করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কুক্কু মানুষটার গলার কাছে কোথাও কামড়ে ধরার চেষ্টা করে—মানুষটা আতংকে চিৎকার করে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে উল্টে পড়ে যায়। কুক্কু তার বুকের উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষটাকে কামড়ে ধরার চেষ্টা করে। মানুষটা দুই হাতে কুক্কুর মুখটাকে ধরে সরানোর চেষ্টা করে। অন্য যে মানুষটা মোটর সাইকেলে বসেছিল সেও মোটর সাইকেল থেকে নেমে ছুটে আসার চেষ্টা করে।

মজিদ, জেবা, মায়া আর অন্যরা ভয় পেয়ে চিৎকার করে ছুটে পালিয়ে গেল। জালালেরও পালানোর এই হচ্ছে সুযোগ সেও এখন ছুটে পালিয়ে যেতে পারে—কিন্তু জালাল বুঝতে পারে এখান থেকে ছুটে পালালেও সে এই মানুষগুলো

থেকে ছুটে পালাতে পারবে না। তাই সে পালাল না, চিৎকার করে বলল, "কুক্কু! সরে যা।" তারপর কুক্কুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে সরিয়ে আনে।

কুক্কু ফর্সা মানুষটাকে ছেড়ে দিল কিন্তু হিংস্র চোখে তার দিকে তাকিয়ে গরগর শব্দ করতে থাকল। ফর্সা মানুষটার মুখে মাটি, গলায় আঁচড়ের দাগ, জামা কাপড়ে ময়লা—সে এখনো বুঝতে পারছে না কী হয়েছে। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে জালাল আর কুক্কুর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে শরীর থেকে ময়লা ঝেড়ে পরিষ্কার করতে থাকে। কুক্কুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে বলে জালালের দিকে খানিকটা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, "এইটা তোর কুকুর?"

"জে। কুত্তার বুদ্ধি তো বেশি হয় না—মনে করছে আমার বিপদ।"

মানুষটা কোমরে হাত দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জালালের দিকে তাকাল, "সবুজ তোকে আর কিছু বলে নাই? তুই সত্যি কথা বলছিস!"

"জে। একেবারে সত্যি কথা। আমি দুইশো পর্যন্ত দিতে রাজি হইছিলাম, হে রাজি হয় নাই।"

"রাজি হয় নাই?"

"না।" জালাল নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মনে অয় ভালাই হইছে আমারে কিছু কয় নাই। কামটা নিশ্চয়ই অনেক বিপদের। আমারও মনে হয় বিপদ হইতো।"

ফর্সা মানুষটা তার গলায় হাত বুলাতে বুলাতে মোটর সাইকেলে ওঠে। মোটর সাইকেলটা গর্জন করে উঠল, ফর্সা মানুষটা বলল, "তোর কুকুরটা আমার কাছে বেচবি?"

জালাল মাথা নাড়ল, বলল, "জে, না।"

মানুষ দুইজন মোটর সাইকেলে চলে যাওয়ার সাথে সাথে নানা কোণা থেকে জেবা, মজিদ, মায়া আর অন্যেরা বের হয়ে আসে, তাদের চোখেমুখে একসাথে বিস্ময় আর আনন্দ। তারা সবাই ছুটে এসে জালালকে জাপটে ধরল, জেবা বলল, "এরা সবুজরে মাইরা ফালাইছে?"

"মনে অয়।"

"তোরেও মাইরা ফালাব?"

"ধুর। আমারে ক্যান মাইরা ফালাবে? আমি কী করছি?"

"তা অইলে তর কাছে কেন আইছে?"

"আমি কী জানি?"

মায়া বলল, "পুলিশে এগো ধরে না ক্যান?"

কেউ মায়ার প্রশ্নের উত্তর দিল না, ছোট বলে এখনো কিছুই জানে না কয়দিনের মাঝে জেনে যাবে পুলিশ কাকে ধরে আর কাকে ধরে না।

লাশকাটা ঘরের কোলাপসিবেল গেটের কাছে গাট্টাগোট্টা কালো মতোন একজন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোরা এখানে ভিড় জমাইছিস ক্যান।"

জেবা বলল, "আমরা সবুজ ভাইরে দেখতে আইছিলাম।"

মানুষটা কয়েক সেকেন্ড কী একটা ভাবল, তারপর বলল, "ডরাইবি না তো?"

জালালের বুকটা ধক করে উঠল, তারপরেও মুখে সাহস এনে বলল, "না।"

"তাহলে আয়। কোনো গোলমাল করবি না, শব্দ করবি না।"

ওরা লাশকাটা ঘরে ঢুকে, ভিতরে ওষুধের ঝাঁঝালো গন্ধ, ছোট একটা ঘর পার হয়ে তারা বড় একটা ঘরে গেল, সেখানে কংক্রিটের টেবিলে একটা লাশ লাল চাদর দিয়ে ঢাকা। চাদরে ছোপ ছোপ রক্ত। মানুষটা চাদর তুলে লাশটার মুখটা বের করে দিল।

কংক্রিটের টেবিলে সবুজ শুয়ে আছে। মাথার উপর সেলাই—গলা দিয়ে বুক পর্যন্ত সেলাই। কী ভয়ংকর একটা দৃশ্য! মায়া একটা চিৎকার করে জেবাকে জাপটে ধরল। জেবা সাথে সাথে তার মুখ চেপে ধরে তাকে বাইরে নিয়ে যায়। অন্যেরা আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, জালাল একটু কাছে গিয়ে সবুজকে স্পর্শ করল, কী আশ্চর্য, শরীরটা বরফের মতো ঠাণ্ডা। ঠিক কী কারণ কে জানে জালালের মনে হয় সবুজকে এভাবে মেরে ফেলার জন্যে সে কোনো না কোনোভাবে দায়ী! সে যদি ঠিক করে চেষ্টা করত তাহলে সবুজকে হয়তো এভাবে মরতে হতো না। জালাল সবুজের বরফের মতো ঠাণ্ডা শরীরটা ছুঁয়ে ফিস ফিস করে বলল, "আমারে মাপ কইরা দিও সবুজ ভাই।"

সেদিন রাত্রে তারা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। কেউ কোনো কথা বলছে না তবু সবারই মনে হচ্ছে প্লাটফর্মের বেঞ্চে সবুজ পা দুলিয়ে বসে তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

৪.

জালাল গোডাউনের পিছনে আবছা অন্ধকার জায়গাটায় নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, সে এখানে সবুজকে দেখেছিল। সবুজ এখানে এসেছিল কিছু একটা লুকিয়ে রাখতে—জালালকে দেখে তাই সবুজ এরকম চমকে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত এখানে লুকিয়ে রেখেছে কী না কে জানে কিন্তু জালাল তবুও একটু খুঁজে দেখতে চাইল।

এখানে লুকিয়ে রাখার জায়গা খুব বেশি নেই। গোডাউনের পুরানো দেওয়ালের ক্ষয়ে যাওয়া ইটের কারণে মাঝে মাঝে কিছু ফাঁক ফোঁকর তৈরি হয়েছে, এর ভেতরে ইচ্ছে করলে কিছু একটা লুকিয়ে রাখা যায়। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফাঁক ফোঁকরগুলো দেখল। কোথাও কিছু নেই—শুধু একটা গর্তে খোঁচা দিতেই সেখান থেকে একটা গোবদা মাকড়শা বের হয়ে তির তির করে ছুটে গেল।

পুরো দেওয়ালটা দেখে কিছু না পেয়ে, সে যখন চলে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ করে একটা ইটের দিকে তার চোখ পড়ল, অন্য সবগুলো ইট রং ওঠা বিবর্ণ, শ্যাওলায় ঢাকা তার মাঝে এই ইটটা একটু পরিষ্কার। জালাল কাছে গিয়ে ইটটাকে ভালো করে লক্ষ করে, মনে হয় এটাকে পরে এখানে ঢোকানো হয়েছে। সে ইটটা ধরে একটু টানাটানি করতেই সেটা ছুটে এলো, পেছনে দোমড়ানো মোচড়ানো একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট। জালাল প্যাকেটটাকে টেনে আনে, এর ভেতরে খানিকটা সাদা পাউডার—ঠিক যেরকম সে ভেবেছিল।

জালাল কিছুক্ষণ প্লাস্টিকের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে এদিক সেদিক তাকাল, কেউ তাকে এখানে এটা হাতে দেখলে অনেক বড় বিপদ হয়ে যাবে, তাই সে প্যাকেটটাকে তাড়াতাড়ি শার্টের নিচে প্যান্টের ভাজে গুঁজে ফেলল, তারপর ইটটা আগের জায়গায় বসিয়ে গোডাউনের পিছনের নির্জন জায়গাটা থেকে বের হয়ে আসে।

প্লাটফর্মে তার মজিদের সাথে দেখা হল, সে খুব মনোযোগ দিয়ে এক টুকরো আখ চিবাচ্ছিল, জালালকে দেখে বলল, "খাবি?"

ঠিক কী কারণ জানা নেই, লাশকাটা ঘরের ঘটনার পর থেকে সবাই তাকে একটু অন্য চোখে দেখে।

জালাল অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে এগিয়ে যায়। একটু এগুতেই মায়ার সাথে দেখা হলো, মায়া চোখ বড় বড় করে বলল, "একটা স্যার আমারে দশ টেহা দিচ্ছে!" সে উত্তেজিত ভঙ্গিতে তাকে নোটটা দেখাল, নোটটা দশ টাকার নয়—পাঁচ টাকার, তারপরেও জালাল মায়াকে এটা শুদ্ধ করে দিতে ভুলে গেল।

জালাল প্লাটফর্মের একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে রেলিঙে পা ঝুলিয়ে বসে। তার শার্টের নিচে প্যান্টের ভাজে সে যে প্লাস্টিকের প্যাকেটটা গুঁজে রেখেছে সেখানে নিশ্চয়ই কয়েক লক্ষ টাকার হেরোইন—ব্যাপারটা চিন্তা করেই তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তার চারপাশে কতো মানুষ হাঁটাহাঁটি করছে কেউ একবারও নিশ্চয়ই অনুমানও করতে পারবে না যে তার মতো একজন মানুষের কাছে এরকম লক্ষ টাকার মূল্যবান একটা জিনিস থাকতে পারে। এটার জন্যে সবুজকে মরতে হয়েছে—তাই এটা শুধু যে দামি তা নয় এটা মনে হয় একই সাথে খুব ভয়ংকর একটা জিনিস।

সে এটা নিয়ে এখন কী করবে? কাগজের মতোন ফর্সা মানুষটার কাছে গিয়ে সে যদি বলে, "আপনারা যে জিনিসটা খুঁজছেন সেটা আমার কাছে আছে। সেটা যদি আপনাদেরকে দেই তাহলে আপনি কত টাকা দিবেন?" জিনিসটার দাম যদি কয়েক লক্ষ টাকা হয় তাহলে তারা তো চোখ বন্ধ করে তাকে কয়েক হাজার টাকা দিতে পারে। কতদিন থেকে সে টাকা জমানোর চেষ্টা করছে—একটু একটু করে সে টাকা জমাচ্ছে, এখন ইচ্ছে করলে একসাথে তার হাজার হাজার টাকা হয়ে যাবে।

উত্তেজনায় জালালের হাত অল্প অল্প কাঁপতে থাকে। বেশ খানিকক্ষণ পর অনেক কষ্ট করে সে নিজেকে শান্ত করল, তারপর সে উঠে দাঁড়াল, এক ব্যাগ হেরোইন নিয়ে সে কী করবে শেষ পর্যন্ত চিন্তা করে বের করেছে।

সবুজের সাথে রেললাইন ধরে হেঁটে হেঁটে সে যে কালভার্টে গিয়েছিল আজকে সে একা একা সেই কালভার্টের দিকে যেতে থাকে। সেদিন দুজন মিলে কথা বলতে বলতে গিয়েছিল, পথটাকে খুব বেশি দূর মনে হয়নি। আজকে মনে হলো জায়গাটা অনেক দূর।

কালভার্টের উপর দাঁড়িয়ে জালাল এদিক সেদিক তাকাল, আশেপাশে কেউ নেই, কেউ তাকে লক্ষ করছে না। তখন সে তার প্যান্টের ভাজে গুঁজে রাখা হেরোইনের প্যাকেটটা বের করল, তারপর সেটা খুলে পুরো হেরোইনটুকু কালভার্টের নিচের ময়লা পানিতে ফেলে দিতে থাকে। বাতাসে হেরোইন উড়ে যায় আশেপাশে মাটিতে ঘাসেও কিছু ছড়িয়ে পড়ে। জালালের নিজেরও বিশ্বাস হয় না সে এইরকম মূল্যবান একটা জিনিস নর্দমায় পানির মাঝে ফেলে দিতে পারে।

পুরো হেরোইনটা পানিতে ফেলে দেবার পর সে প্লাস্টিকের ব্যাগটাও পানিতে ছুড়ে দিল। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্যাকেটটা ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হয়ে না গেল জালাল কালভার্ট থেকে নড়ল না।

জালাল যখন প্লাটফর্মে ফিরে এসেছে তখন মজিদ একটা আমড়া খাচ্ছে। জালালকে দেখে বলল, "এক কামড় খাবি?"

জালাল বলল, "দে।" মজিদ আমড়াটা এগিয়ে দেয় জালাল এক কামড় খেয়ে মজিদকে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ একটু হেসে ফেলল। সে একটু আগেই একজন লক্ষপতি ছিল এখন সে আবার হতদরিদ্র ছেলে!

মজিদ জিজ্ঞেস করল, "হাসিস ক্যান?"

জালাল বলল, "এমনিই!"

৫.

ইভা ব্যাগটা পাশে রেখে খবরের কাগজটা খুলে। কোনদিন রাস্তাঘাটে কী রকম ট্রাফিক জ্যাম হবে আগে থেকে অনুমান করা যায় না—তাই যেখানেই যেতে চায় সেখানে একটু আগে না হয় একটু পরে পৌঁছায়। ট্রেন ধরতে হলে একটু পরে পৌঁছানোর কোনো উপায় নেই তাই সে সাধারণত একটু আগেই পৌঁছে যায়। আজকেও সে একটু আগেই পৌঁছে গেছে, স্টেশনটা এখনো মোটামুটি ফাঁকা, প্যাসেঞ্জাররা আসে নি।

খবরের কাগজের হেড লাইনগুলো পড়া শেষ করার আগেই সে বাচ্চাদের কণ্ঠে আনন্দধ্বনি শুনতে পেল। ছোট বড় নানা বয়সী ছেলে এবং মেয়ে তার দিকে ছুটে আসছে, তাদের ময়লা কাপড়, খালি পা এবং নোংরা শরীর কিন্তু মুখগুলো আনন্দে ঝলমল করছে। "দুই টেকী আপা দুই টেকী আপা" বলে চিৎকার করতে করতে তারা ইভাকে ঘিরে ফেলল।

ইভা হাসি হাসি মুখ করে বলল, "কী খবর তোমাদের?"

সাথে সাথে সবার মুখ শক্ত হয়ে যায়, মায়া সবার আগে বলল, "সবুজ ভাইরে মাইরা ফালাইছে।"

অন্যেরাও তখন সবুজকে মেরে ফেলার ঘটনাটা নিজের মতো করে বলতে থাকে। সবাই কথা বলছে, একজন থেকে আরেকজন বেশি উত্তেজিত। ইভা কাউকেই বাধা দিল না। সে স্থানীয় পত্রিকায় ঘটনাটার কথা পড়েছে আর সাথে সাথে এই বাচ্চাগুলোর কথা মনে পড়েছে। ছোট বাচ্চাদের সাধারণত এরকম ভয়ানক ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় না—মাঝখানে, বড়রা থাকে। তারা ছোটদের আড়াল করে রাখে। কিন্তু এই বাচ্চাদেরকে আড়াল করে রাখার কেউ নেই। ইভা অবশ্যি বেশ অবাক হয়ে আবিষ্কার করল বাচ্চাগুলো নিজেরাই বেশ সামলে উঠেছে। পথে ঘাটে থাকতে হয় বলে এই বাচ্চাগুলোর মনে হয় অনেক তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়।

সবুজের গল্প শেষ হতে অনেকক্ষণ সময় লাগল—কারণ সবারই কিছু না কিছু বলার ছিল আর যতক্ষণ পর্যন্ত না "দুই টেকী আপা" পুরোটুকু শুনে মাথা না নাড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বলেই গেছে। ইভা যে তাদের সবার কথা বুঝেছে তা নয়, বাচ্চাগুলো প্রাণপণে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করেছে তার কারণে কথাগুলো আরো দুর্বোধ্য হয়ে গেছে, সরাসরি নিজের মতো করে কথা বললে মনে হয় বোঝা সহজ হত। ইভা অবশ্যি বর্ণনার খুঁটিনাটি থেকে বাচ্চাগুলোর মুখের ভাবভঙ্গি চকচকে চোখ কথা বলার আগ্রহ এগুলোতেই বেশি নজর দিচ্ছিল। তবে যখন সে লাশকাটা ঘরের সামনে কাগজের মতো ফর্সা মানুষটার সাথে জালালের কথাবার্তা এবং কুক্কু নামের তেজস্বী কুকুরের বিশাল বীরত্বের কাহিনী শুনতে পেল তখন হঠাৎ করে সে গল্পের বিষয়বস্তুতে আগ্রহী হয়ে উঠল। ইভা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "মানুষ দুজন এসে তোমাদের কী জিজ্ঞেস করেছে?"

মজিদ বলল, "জিগাইছে আমাগো কাছে সবুজ ভাই হেরোইনের প্যাকেট দিছে কী না!"

জেবা মাথা নেড়ে বলল, "না-না—হেরোইন কয় নাই। কইছে পেলাস্টিকের ব্যাগে সাদা পাউডার।"

অন্যেরা মাথা নেড়ে জেবাকে সমর্থন করল, বলল, "সাদা পাউডার, সাদা পাউডার।"

"তোমরা হেরোইন চিনো?"

" দেখি নাইক্কা। কিন্তুক হেরোইনখোর চিনি। হেরা খুবই ডরের। দেখতে এইরকম—" বলে জেবা হেরোইনখোরের চেহারা কেমন হয় সেটা দেখাল, জিব বের হয়ে এসেছে, চোখ ঢুলুঢুলু, দুই হাত বুকের কাছে ঝুলে আছে। জেবার অভিনয় নিশ্চয়ই নিখুঁত হয়েছে কারণ সবাই আনন্দে হি হি করে হাসল এবং সবাই তখন হেরোইনখোর সেজে অভিনয় করতে লাগল। একজন আরেকজনকে দেখে তখন হেসে গড়াগড়ি খেতে থেকে। শুধুমাত্র এই বাচ্চাগুলোর পক্ষেই মনে হয় এতো অল্পে এতো আনন্দ পাওয়া সম্ভব।

ইভা তখন জালালের সাথে কাগজের মতো ফর্সা মানুষের ঘটনাটা আরো একবার শুনল এবং এবং তাদের মাঝে জালাল কে ইভা জানাতে চাইল। জালাল তখন সেখানে ছিল না তাই সাথে সাথে কয়েকজন জালালকে খুঁজে আনতে চলে গেল।

জালাল তার ভেজাল মিনারেল ওয়াটার বিক্রি করছিল, যখন খবর পেল দুই টেকী আপা তাকে দেখতে চাইছে তখন তখনই সে হাজির হয়ে যায়। ইভা জিজ্ঞেস করল, "তুমি জালাল?"

"জে।" জালাল মাথা নাড়ে।

"তোমার কুক্কু নামের একটা তেজি কুকুর আছে?"

জালাল দাঁত বের করে হাসল, বলল, "জে। কুক্কুর তেজ খুব বেশি!"

ইভা বলল, "সেটা ঠিক আছে, কিন্তু সবসময় তো তোমাকে বাঁচানোর জন্যে কুক্কু তোমার সাথে থাকবে না, তাই খুব সাবধান।"

জালাল বলল, "জে আপা। আমি সাবধান থাকি।"

"ভুলেও কখনো ওরকম মানুষের ধারে কাছে যাবে না।"

জালাল মাথা নাড়ল, বলল, "যাই না।"

"তোমাদের বন্ধু সবুজ গিয়েছিল বলে তার কী অবস্থা হয়েছে দেখেছ।"

"জে আপা।"

ইভা বলল, "গুড।" তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "এবার একজন একজন করে এসো, তোমাদের দুই টাকা করে দিই।"

বাচ্চাগুলোর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। প্রথম প্রথম ঘাড় বাঁকা করে বুকের কাছে হাত এনে কাতর ভঙ্গিতে সবাই তার কাছে ভিক্ষা চাইত। এখন তার সাথে সবার পরিচয় হয়েছে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে এখন আর কেউ তার কাছে কিছু চায় না। আগে সম্পর্ক ছিল বড়লোক মহিলা আর গরিব ছেলে মেয়ের সম্পর্ক। এখন সম্পর্কটা অনেকটা পরিচিত বন্ধুর মতো। বন্ধুর কাছে তো আর টাকা চাওয়া যায় না! ইভা দেখেছে এখন তারা কাড়াকাড়ি করে টাকা নেয় না। নেয়ার সময় তাদের মুখে একটু লাজুক লাজুক ভাব চলে আসে। এমনকি একজনকে যদি ভুল করে সে দিতে ভুলেও যায় সে নিজে কখনো কিছু বলে না, অন্যেরা ইভাকে মনে করিয়ে দেয়।

সবাইকে দেয়া শেষ হবার পর ইভা জালালকে ডাকল, বলল, "জালাল, আমাকে এক বোতল মিনারেল ওয়াটার দাও দেখি।"

জালাল কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে, "মিনারেল ওয়াটার?"

"হ্যাঁ।"

"আপা আপনারে এনে দিই।"

"কেন? এনে দিতে হবে কেন? তোমার হাতের বোতলগুলো দোষ করল কী?"

জালাল কোনো উত্তর না দিয়ে ছুটে চলে গেল। কয়েক মিনিটের মাঝেই দোকান থেকে সত্যিকারের একটা বোতল এনে ইভার হাতে দিল। ইভা পানির

বোতলটা হাতে নিয়ে একটু অবাক হয়ে বলল, "তোমার হাতেরগুলোর সাথে এটার পার্থক্য কী?"

জালাল কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

জেবা দাঁত বের করে হেসে বলল, "আফা, ওর হাতের গুলান ভুয়া! ভেতরে কলের পানি।"

জালাল চোখ পাকিয়ে জেবার দিকে তাকাল, কিন্তু জেবা সেটাকে পাত্তা দিল না, বলল, "হে শহর থাইকা এই ভুয়া পানি আনে!"

ইভা হাসি হাসি মুখে জালালের দিকে তাকাল, "সত্যি?"

জালাল কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল, তারপর মাথা তুলে বলল, "আফনারে কুনোদিন আমি ভেজাল পানি দিমু না আপা।"

"ঠিক আছে। থ্যাংকু। কাউকেই না দিলে আরো ভালো!"

ঠিক তখন দূরে ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল এবং সাথে সাথে বাচ্চাদের মাঝে একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তারা প্লাটফর্মের নানা জায়গায় দাঁড়িয়ে ট্রেনটা থামা মাত্র সেটাতে ওঠার প্রস্তুতি নিতে থাকে।

দেখতে দেখতে বিশাল ট্রেনটা প্লাটফর্ম কাঁপিয়ে স্টেশনে ঢুকে গেল, ট্রেনটার গতি কমতে শুরু করেছে বাচ্চাগুলো নিজেদের জায়গা ভাগাভাগি করে দাঁড়িয়ে আছে। ইভা হঠাৎ করে লক্ষ করল মায়ার সাথে একটা ছেলের কী একটা নিয়ে ঝগড়া লেগে গেছে এবং কিছু বোঝার আগে ছেলেটা ধাক্কা দিয়ে মায়াকে চলন্ত ট্রেনের নিচে ফেলে দিল। ঘটনাটা এতো তাড়াতাড়ি ঘটেছে যে মায়া চিৎকার করার পর্যন্ত সময় পেল না, দুই হাতে মুখ ঢেকে সে বসে পড়ে। তার চোখ খোলার সাহস হয় না। মানুষজনের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে কয়েক সেকেন্ড পর চোখ খুলে সে দেখল জালাল লাফ দিয়ে প্লাটফর্মে শুয়ে মায়াকে ধরে ফেলেছে এবং চিৎকার করে কিছু একটা বলছে, ট্রেনের শব্দের জন্যে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। জালাল ভয়ানক বিপজ্জনক ভঙ্গিতে শুয়ে আছে, তার ঠিক মাথার উপর দিয়ে ট্রেনের পাদানিগুলো প্রায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে, একটুখানি উনিশ বিশ হলেই জালালের মাথা গুড়ো হয়ে যাবে।

ইভা ছুটে গেল এবং নিচের দৃশ্যটা দেখে তার রক্ত জমে গেল। রেল লাইনের উপর দিয়ে ট্রেনের ধাতব চাকাগুলো বিকট শব্দ করতে করতে যাচ্ছে এবং তার এক ইঞ্চিরও কাছে মায়া ঝুলে আছে, জালাল তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। একটু নড়লেই মুহূর্তের মাঝে বাচ্চা মেয়েটি ট্রেনের চাকার নিচে ছিন্ন

ভিন্ন হয়ে যাবে। ট্রেনটি থামছে, কেন আরো তাড়াতাড়ি থামছে না ভেবে সে অস্থির হয়ে যায়। যতক্ষণ পুরোপুরি না থামছে জালাল কী মায়াকে ধরে রাখতে পারবে? শেষ পর্যন্ত ট্রেনটি থামল এবং ইভার কাছে মনে হলো তার মাঝে বুঝি অনন্তকাল পার হয়ে গেছে।

ইভার পাশাপাশি আরো অনেকে উবু হয়ে দৃশ্যটা দেখছিল, ট্রেনটা থামার পর সবাই মিলে মায়াকে টেনে উপরে তুলে আনে। জালাল এদিক সেদিক তাকিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া তার ভুয়া পানির বোতলগুলো উদ্ধার করে হাতে নিয়ে যে ছেলেটি ধাক্কা দিয়ে মায়াকে ট্রেনের নিচে ফেলে দিয়েছে তাকে খুঁজতে থাকে। বেশি খুঁজতে হলো না ছেলেটি কাছাকাছি অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে ছিল। কোনোকিছু নিয়ে গোলমাল হলে একজন আরেকজনকে ধাক্কা দেওয়া এমন কোনো বিচিত্র বিষয় না, কিন্তু মায়া যে ধাক্কা খেয়ে একেবারে ট্রেনের নিচে পড়ে যাবে সেটা সে নিজেও বুঝতে পারে নি।

জালাল এবারে সেই ছেলেটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মুহূর্তের মাঝে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। ছেলেটাকে নিচে ফেলে জালাল তার বুকের উপর বসে হাত মুঠি করে তার মুখের মাঝে মারে। চিৎকার করে তার চুলগুলো ধরে হিংস্র ভঙ্গিতে ছেলেটার মাথা মাটিতে ঠুকতে থাকে। একজন যে আরেকজনকে এরকম নির্দয়ের মতো মারতে পারে ইভা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারত না। ইভা ছুটে গিয়ে কোনোমতে জালালকে টেনে সরিয়ে আনে। জালাল রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলে, "এই হারামজাদা সব সময় এইরকম করে, আরেকদিন এইরকম করে ধাক্কা দিছিল—"

ইভা জালালের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "ব্যাস! অনেক হয়েছে। ছেড়ে দাও। তুমি এই মাত্র এই মেয়েটার জীবন বাঁচিয়েছ। তুমি না থাকলে এই মেয়েটা মরে যেত। আমরা সারাজীবনেও কারো জীবন বাঁচাতে পারি না—তুমি এতোটুকুন ছেলে হয়ে আরেকজনের জীবন বাঁচিয়েছ। তোমার রাগ করা মানায় না—"

জালালের রাগ একটু কমে আসে। মায়া কাছে দাঁড়িয়ে ছিল—সে এখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ইভা তাকে ডেকে এনে জড়িয়ে ধরে বলল, "কাঁদে না বোকা মেয়ে। খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছ। তোমার মতো লাকি মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি।"

আশেপাশে যাত্রীরা নানা ধরনের মন্তব্য করতে থাকে কিন্তু বাচ্চাগুলোর সেগুলো নিয়ে কোনো মাথাব্যথা দেখা গেল না—তারা আবার নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। মায়াকে কিছুক্ষণের মাঝেই দয়ালু টাইপের প্যাসেঞ্জারদের পিছনে পিছনে ভাত খাওয়ার টাকার জন্যে ছুটতে দেখা গেল। জালাল তার ভুয়া মিনারেল ওয়াটার বিক্রি করতে শুরু করে দিল। দেখে বোঝাই যায় না কয়েক মুহূর্ত আগে এখানে এতো বড় একটা ঘটনা ঘটেছে। ইভা অবাক হয়ে ভাবে না জানি প্রতিদিন কতবার এরা মৃত্যুর এতো কাছাকাছি থেকে ফিরে আসে।

ট্রেন ঢাকা পৌঁছাল সন্ধের একটু পর। ইভার বাসা পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত আটটা হয়ে যায়। বাসায় গিয়ে দেখে তার ভাই এবং ভাবী তাদের বাচ্চা দুটোকে নিয়ে এসেছে। ইভাকে দেখে সবাই খুব খুশি হয়ে উঠল। ভাবী বলল, "ভালোই হলো তোমার সাথে দেখা হলো। আমি খবর পাই তুমি প্রতি সপ্তাহে আস কিন্তু দেখা হয় না!"

ইভা বলল, "কেমন করে দেখা হবে, সবাই এতো ব্যস্ত!"

ভাবী মাথা নাড়ল, "তোমার এনার্জি আছে। আমি হলে কিছুতেই পারতাম না। প্রতি সপ্তাহে এরকম ট্রেন জার্নি। বাবারে বাবা!"

ইভা হাসল, "আমার সময় কেটে যায়। ট্রেন জার্নির কারণে বইপড়া হচ্ছে। অনেকদিন থেকে পড়ব পড়ব বলে যে বইগুলো জমা করে রেখেছিলাম এই ধাক্কায় সব পড়া হয়ে যাচ্ছে!"

ভাবীর বাচ্চা দুইজন এইসময় ছুটে এলো, বড়টি ছেলে বয়স তেরো—মাত্র টিনএজার হয়েছে কিন্তু চেহারায় ভাবভঙ্গিতে এখনো তার ছাপ পড়ে নি। ছোটজন মেয়ে, বয়স আট। ছেলেটি বলল, "ফুপ্পি তুমি আমার বার্থডে-তে আসনি।"

ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ে তাই তার বাংলা উচ্চারণে একটা ইংরেজি ইংরেজি ভাব। ইভা মুখে অপরাধীর ভাব করে বলল, "আই এ্যাম সরি! তোমরা সব প্ল্যান করে উইক ডে'তে জন্ম নিচ্ছ আমি কেমন করে আসব? এর পরের বার থেকে উইক এন্ডে জন্ম নিবে। আমি উইক এন্ডে ঢাকা থাকি!"

ছেলেটি হাসল, ইংরেজি বলল, "যা মজা হয়েছিল! একটা নতুন গেম বের হয়েছে, নেট ব্যবহার করে খেলা যায় আমরা সেটা দিয়ে খেলেছি।"

মেয়েটি আদুরে গলায় বলল, "আমাকে নেয়নি।"

"তোকে কেমন করে নিব? তুই কি খেলতে পারিস?"

ইভা জিজ্ঞেস করল, "অনেক গিফট পেয়েছ?"

ছেলেটি মাথা নাড়ল, " হ্যাঁ ফুপ্পি। অনেক। একটা এমপি থ্রি প্লেয়ার দিয়েছে আমার ফ্রেন্ডরা—যা কিউট!"

ইভা বলল, "আমার কাছ থেকে তোমার একটা গিফট পাওনা থাকল। বল কী চাও।"

ছেলেটি হাসি হাসি মুখে বলল, "থ্যাংকস ফুপ্পি। তোমার যেটা ইচ্ছা দিও।"

"বই?"

ছেলেটার খুব পছন্দ হলো না কিন্তু সেটা প্রকাশ করল না, বলল, "হ্যাঁ। অফকোর্স বই দিতে পার।" ইংরেজিতে যোগ করল, "বই আমার খুব পছন্দ।"

মেয়েটা বলল, "আমার বই ভালো লাগে না।"

ইভা বলল, "তুমি আরেকটু বড় হও তখন তোমারো বই ভালো লাগবে।"

ছেলেটা হঠাৎ ইভার একটু কাছে এগিয়ে এসে ইংরেজিতে বলল, "ফুপ্পি, তুমি আমার একটা উপকার করতে পারবে?"

"কী উপকার?"

"তুমি আম্মুকে একটা জিনিস বোঝাতে পারবে?"

"কী জিনিস?"

"আমাদের পুরো ক্লাশ একটা ট্রিপে যাচ্ছে, কিন্তু আম্মু আমাকে যেতে দিতে চায় না।"

" কেন?"

"আম্মু বলে আমি নাকি নিজে নিজে ম্যানেজ করতে পারব না। সিক হয়ে যাব। হ্যানো তেনো। সবাই যাচ্ছে—কী মজা হবে আর আমি যেতে পারব না!"

ইভা বলল, "ঠিক আছে ভাবীকে বলব।"

ঠিক তখন ভাবী এক কাপ চা খেতে খেতে এদিকে আসছিল। ইভা বলল, "ভাবী, তুমি নাকি সাদকে তার ক্লাশের বন্ধুদের সাথে ট্রিপে যেতে দিচ্ছ না?"

"কেমন করে দিব? এখনো তুলে না দিলে খেতে পারে না। ট্রিপে গিয়ে নিজে নিজে কেমন করে ম্যানেজ করবে?"

"পারবে ভাবী, পারবে। যখন নিজের উপর পড়বে তখন নিজেই ম্যানেজ করতে পারবে।"

ভাবী দুশ্চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ল, বলল, "জানি না বাপু। টিভি খুললেই দেখি কিছু না কিছু হচ্ছে, এই এ্যাকসিডেন্ট ওই এ্যাকসিডেন্ট ভয় লাগে। কখন যে কী হয় শান্তিতে ঘুমাতে পারি না।"

"এতো ভয় পেলে হবে না। টিভিতে তো আর ভালো জিনিসগুলি দেখায় না, খালি খারাপগুলো দেখায়—"

"তা ছাড়া লেখাপড়া নিয়েও তো ঝামেলা। ম্যাথ-এর খুব ভালো একটা টিউটর পেয়েছি, ঝুম্পা মিস—খুব রাশ। একদিন এ্যাবসেন্ট থাকলে রাগ করে।"

ইভা কিছু বলল না, এই বিষয়গুলো সে বুঝতে পারে না। একজন একটা স্কুলে পড়লেও কেন আলাদা কোচিং করতে হবে? ভাবী চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "একটা গাড়ি একটা ড্রাইভার চরকির মতো দৌড়াচ্ছে। স্কুলে নিয়ে যাও, স্কুল থেকে আন, কোচিংয়ে নিয়ে যাও সেখান থেকে অন্য কোচিংয়ে নিয়ে যাও, তোমার ভাইয়ের অফিস, গ্রোসারি—অন্য কিছু করার সময় কোথায় বল?"

ইভা এবারেও কিছু বলল না। সংসারের ঝামেলার কথা ভাবীর প্রিয় বিষয়, ভাবী একবার বলতে শুরু করলে সহজে থামতে পারে না। ভাবী বলেই যেতে থাকে, ইভা শুনতে শুনতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সে একবার সাদ আরেকবার মাহরীনের দিকে তাকাল। কয়েক ঘন্টা আগেই স্টেশনে এদের থেকেও ছোট ছোট বাচ্চাদের দেখে এসেছে—তাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই, কী অবলীলায় কী বিচিত্র একটা জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে। আর তার ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা কী বিচিত্র আরেকটা জীবনের ভেতর দিয়ে বড় হচ্ছে। সাদ আর মাহরীনকে যদি একদিন জালাল আর মায়ার সাথে বসিয়ে দেয়া হয় তাহলে কী তারা নিজেদের ভেতর কথা বলার কোনো একটা কিছু খুঁজে পাবে?

মনে হয় না। প্রায় একই বয়সের বাচ্চা কিন্তু তাদের জীবনের মাঝে এতোটুকু মিল নেই।

৬.

জালাল ঘুম থেকে ওঠে একটা থাম্বায় হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। গত রাতে সে তার মা'কে স্বপ্নে দেখেছে। মা প্লাটফর্মের কাছে দাঁড়িয়েছিল, ঝিকঝিক শব্দ করে ট্রেন আসছে তখন জালাল বলল, "মা একটু এতো কাছে খাড়াইও না, দূরে থাকো।" মা বলল, "ক্যান? দূরে খাড়াইতে হবি ক্যান?" জালাল বলল, "এ্যাকসিডেন্ট হতি পারে।" মা তখন দূরে সরে যেতে চাচ্ছিল ঠিক তখন কোথা থেকে কাগজের মতো সাদা কয়েকজন মানুষ এসে মাকে ধরে রাখল। ট্রেনটা যখন খুব কাছাকাছি এসেছে তখন তারা ধাক্কা দিয়ে মা'কে ট্রেনের নিচে ফেলে দিল। চোখের নিচে ট্রেনের চাকার নিচে মা কেটেকুটে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল। জালাল "মা মা" চিৎকার করে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। তারপর অনেকক্ষণ ঘুমাতে পারে নি, কী ভয়ংকর একটা স্বপ্ন।

সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর জালালের আবার স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। কতোদিন সে তার মা'কে দেখেনি—শেষ পর্যন্ত যখন দেখল তখন এরকম খারাপ একটা স্বপ্ন দেখল। পুরো স্বপ্নটা মনে হচ্ছে একেবারে সত্যি।

জালালকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে জেবা জিজ্ঞেস করল, "এই, জালাইল্যা, কী হইছে তোর?"

জালাল বলল, "রাত্রে খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখছি।"

জেবার মনে হয় একটু কৌতূহল হলো। সে স্বপ্ন, জ্বিন, পরী, ভূত, পীর, ফকির, তাবিজ এইসব খুব পছন্দ করে। জালালের সামনে বসে জিজ্ঞেস করল, "কী স্বপ্নে দেখছস?"

জালাল তখন জেবাকে পুরো স্বপ্নটা বলল। শুনে জেবার মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। সে মাথা নেড়ে বলল, "স্বপ্নটা খারাপ। তোর একটা সদকা দেওন দরকার।"

"সদকা?"

"হয়। তয় আরো একটা কথা আছে।"

"কী কথা।"

"স্বপ্নে যদি কেউরে মরতে দেখস তাহলে তার আয়ু বাড়ে। মনে লয় তর মায়ের আয়ু বাড়ছে।" জেবা তখন এর আগে কাকে কাকে স্বপ্নে মরতে দেখেছে এবং তাদের সবাই কেমন হাট্টাকাট্টা জোয়ান হয়ে বেঁচে আছে জালালকে তার একটা লম্বা তালিকা শোনাল।

শুনে জালালের মনটা একটু শান্ত হয়। জেবা অবশ্যি তারপরেও গম্ভীর মুখে বলল, "স্বপ্নের কথা কাউরে কয়া ফেললে হেইডা আর সত্যি হয় না। ঘুম থাইকা উইঠাই বলতি হয়।"

জালাল বলল, "তাইতো বলছি।"

জেবা বলল, "হেইডা বালা কাম করছস। তয়—"

"তয় কী?"

"মনে লয় মাজারে কয়টা টেহা দিয়া আয়।"

জালাল মাথা নাড়ল, বলল, "দিমু। আইজকেই দিমু।"

জালাল বিকাল বেলা শহরে গিয়ে মাজারের বিশাল বাক্সের ভেতর দশ টাকার একটা নোট ফেলে দিল। সেখানে উরস না কী যেন হচ্ছে তাই সবাইকে খাওয়াচ্ছে, জালাল অন্যদের সাথে কলাপাতা পেতে বসে পড়ল। ভাত, ডাল আর গরুর মাংস—তবে তার পাতে মাংস পড়ল না শুধু ঝোল আর এক টুকরা আলু। এতো মানুষ খাচ্ছে যেখানে সত্যি সত্যি সে গোশতের টুকরা পাবে সেটা অবশ্যি সে আশাও করে নি।

জালাল ভেবেছিল মাজারে দশ টাকার নোটটা দিয়ে আসার পর তার মায়ের বিপদ কেটে যাবে কিন্তু পরের রাতেও সে তার মা'কে স্বপ্ন দেখল। তার মায়ের ধবধবে সাদা চুল আর একটা ময়লা শাড়ি পরে বিলাপ করছে। ভোরবেলা জেবা স্বপ্নের কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, "এই স্বপ্নের নিশানা ভালা না।"

জালাল বলল, "কী নিশানা?"

"মনে হয় তর মায়ের বিপদ হইছে।"

"বিপদ? কী বিপদ?" জালাল তার মায়ের কী বিপদ হতে পারে, বুঝে পেল না। তার বাবা মারা যাবার পর চাচাদের সংসারে মা লাথি-ঝাটা খেয়ে

কোনোমতে টিকে আছে। ছোট বোনটা খেতে না পেয়ে শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেল। কী কারণ কে জানে বড় চাচার পুরো রাগটা ছিল জালালের উপর—কিছু হলেই জালালকে ধরে গরুর মতো পেটাত। সেজন্যে জালাল শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে—ভেবেছিল পালানোর আগে বড় চাচার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিবে কিন্তু মায়ের কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত আর লাগায় নি। এই মায়ের নতুন করে আর কি বিপদ হতে পারে?

জেবা গম্ভীর হয়ে বলল, "সদকা দে।"

"সদকা?"

"হ। একটা মুরগি।"

একটা মুরগি কিনতে যত টাকা বের হয়ে যাবে তার থেকে কম টাকা খরচ করে সে বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে পারে। বাড়ি থাইকা পালানোর পর সে আর একবারও বাড়ি যায়নি—একবার গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে আসার সময় হয়েছে। যদি দেখা যায় আসলেই মায়ের বিপদ তাহলে তখন না হয় সদকা দেয়া যাবে।

জালাল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বাড়ি থাইকা ঘুরি আসি।"

জেবার মুখে দুশ্চিন্তার একটা ছাপ পড়ল, "ঘুরি আসবি নাকি আর আসবি না?"

"আসমু।"

জেবা জানে তাদের জীবনে কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই, জালাল একবার বাড়ি গেলে হয়তো আর কোনোদিন ফিরেই আসবে না। স্টেশনে তারা যারা থাকে ঝগড়াঝাটি আর মারামারি যাই করুক সবাই মিলে তাদের একটা পরিবার। একজন চলে গেলে পরিবারের একজন কমে যায়। জালালের মাথা থেকে বাড়ি যাওয়ার বুদ্ধিটা সরানোর জন্যে বলল, "কোর্টের সামনে তাবিজ বিক্রি হয়। বাড়ি যাওনের দরকার কী? ভালা দেইখা একটা তাবিজ কিন। গরম তাবিজ আছে, আসল সোলেমানি তাবিজ।"

জালাল মাথা নেড়ে বলল, "মায়ের যদি বিপদ হয় তাহলে আমার তাবিজ পইরা কী লাভ?"

যুক্তিটা ফেলে দেবার মতো না। তাই জেবা আর কোনো কথা বলল না।

দুপুর বেলা জালাল আবার জেবার কাছে এল, বলল, "জেবা তুই একটা কাম করতি পারবি?"

"কী কাম?"

জালাল একটু লাজুক মুখে বলল, "মায়ের জন্যি একটা শাড়ি কিনি দিতি পারবি?"

জেবা চোখ কপালে তুলে বলল, "লতুন শাড়ি?"

"হয়।"

জেবা তখনো বিশ্বাস করতে পারে না যে জালাল তার মায়ের জন্যে নতুন একটা শাড়ি কিনতে পারে। অবাক হয়ে বলল, "তোর কাছে টেহা আছে?"

অনেকদিন থেকে জালাল টাকা জমিয়ে আসছে, তার ইচ্ছে সে একটা পান সিগারেট নাহলে চায়ের দোকান দিবে। বেশ কিছু টাকা জমা হয়েছে। সেখান থেকে সে ইচ্ছে করলেই মায়ের জন্যে শাড়ি কিনতে পারে। জালাল মাথা নেড়ে বলল, "হয়ে যাবি মনে লয়।"

জেবা তখনো আপত্তি করল, "লতুন শাড়ির দরকার কী? অনেক ভালা পুরান শাড়ি পাওয়া যায়।"

জালাল মাথা নাড়ল, বলল, "না। লতুন শাড়ি কিনমু।"

কাজেই বিকালবেলা জেবাকে নিয়ে জালাল শাড়ি কিনতে বের হলো। জেবার সাথে মায়া চিনে জোঁকের মতো লেগে থাকে তাই তাকেও সাথে নিতে হলো।

বড় বাজারের শাড়ির দোকানের মানুষেরা তাদেরকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল—তারা নতুন শাড়ি কিনতে পারে সেটা তারা বিশ্বাসই করল না। জালাল তার প্যান্টের সেলাই থেকে কিছু টাকা বের করে হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছিল সেই নোটগুলো দেখানোর পরও দোকানদার তাদের বিশ্বাস করল না। জেবা একটা ঝগড়া শুরু করে দিতে যাচ্ছিল জালাল শুধু শুধু সময় নষ্ট করল না। জেবাকে নিয়ে টিএন্ডটি বস্তির কাছে গরিব মানুষদের জামা কাপড়ের দোকানে হাজির হলো। বুড়ো দোকানি তাদেরকে শাড়ি নামিয়ে দেখাল, জেবা শাড়ির কাপড় পরীক্ষা করে দেখল, শরীরের সাথে লাগিয়ে দেখল তারপর নীল জমিনের উপর কমলা রঙের বড় বড় ফুলওয়ালা একটা শাড়ি পছন্দ করে দিল। দোকানের নতুন নতুন কাপড় দেখে জালাল তার ছোট বোনটার জন্যেও একটা ফ্রক কিনল। চলে আসার সময় তার কী মনে হলো কে জানে নিজের জন্যেও একটা জিনসের প্যান্ট আর শার্ট কিনে ফেলল! এই বিলাসিতার জন্যে তার পান-সিগারেটের কিংবা চায়ের দোকান হয়তো আরো ছয় মাস পিছিয়ে গেছে, কিন্তু কী আর করা!

ফিরে আসার সময় মায়া বলল, "ভাই।"

জালাল উত্তর দিল, "কী?"

"তোমার এতো টেহা, আমাগো বিরানি খাওয়াবা?"

মুখ খিঁচিয়ে ধমক দিতে গিয়ে জালাল থেমে গেল। কয়দিন আগে মায়া সবুজের কাছে বিরিয়ানি খেতে চেয়েছিল, সেই সবুজ এখন দশ হাত মাটির নিচে। জালাল মনে মনে হিসাব করে দেখল যে তার কাছে যত টাকা আছে ইচ্ছে করলে সে একটা বিরিয়ানীর প্যাকেট কিনতে পারে, তিনজনে মিলে সেটা খেতেও পারে। তারপরেও তার মনটা একটু খুঁতখুঁত করতে থাকে—এতোগুলো টাকা বিরিয়ানির প্যাকেট কিনে নষ্ট করবে?

জেবা বলল, "বড় বাজারের মোড়ে বিরানির দোকান আছে। এই এত্তোগুলা কইরা দেয়।"

জেবা বিরিয়ানির যে পরিমাণটা দেখাল সেটা সত্যি হবার সম্ভাবনা কম। তারপরেও জালাল শেষ পর্যন্ত রাজি হলো। তখন তিনজন মিলে হেঁটে হেঁটে বড় বাজারে বিরিয়ানির দোকানটিতে হাজির হলো। বাইরে বিশাল একটা ডেকচিতে বিরিয়ানি রান্না করা আছে। কেউ ইচ্ছা করলে প্যাকেটে করে কিনতে পারে কিংবা ভেতরে বসে খেতে পারে। তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিবে না জেনেও তিনজন একবার ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করল। ডেকচির সামনে বসে থাকা কালো মোটা মানুষটা খেঁকিয়ে উঠল, "কই যাস?"

জেবা মুখ শক্ত করে বলল, "বিরানি খামু।"

মানুষটা মুখ শক্ত করে বলল, "ইহ্! বিরানি খামু! যা ভাগ।"

জালাল বলল, "টেহা দিয়ে বিরানি খামু, আপনাগো সমিস্যা কী?"

জালালের কথায় মানুষটা মনে হয় খুব মজা পেল, বলল, "বেশি টাকা হইছে? ভাগ এইখান থেকে।"

তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিবে সেটা অবশ্যি তারাও আশা করে নি তাই আর তর্ক-বিতর্কের মাঝে গেল না। জালাল তার মুঠি থেকে একটা নোট বের করে কালো মোটা মানুষটারে দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এক প্যাকেট বিরানি।"

মানুষটা নোটটা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল তারপর একটা প্যাকেট নিয়ে সেটাতে বিরিয়ানি ভরে দেয়। জেবা বলল, "কম দিছেন। আরো দেন।"

মানুষটা চোখ পাকিয়ে জেবার দিকে তাকাল তারপর সত্যি সত্যি প্যাকেটটাতে আরেকটু বিরিয়ানি ঠেসে দিল। মায়া বলল, "গোশতু বেশি কইরা দেন।"

মানুষটা মায়ার দিকে ঘুরে তাকাল, মায়ার সাইজ দেখে তার মুখে একটা আজব ধরনের হাসি ফুটে উঠে। কিন্তু সত্যি সত্যি ডেকচির ভেতরে তাকিয়ে আরেক টুকরা গোশত এনে বিরানির প্যাকেটে ঢুকিয়ে দিল। মানুষটি তারপর প্যাকেটটা বন্ধ করে জালালের দিকে এগিয়ে দেয়।

জালাল প্যাকেটটা হাতে নেয়, গরম গরম বিরিয়ানি। প্যাকেটটা খুলতেই ভেতর থেকে অপূর্ব একটা ঘ্রাণ বের হয়ে আসে। তাদের তিনজনের জিবেই পানি এসে যায়। কোথায় বসে খাবে সেটা নিয়ে চিন্তা করে তারা সময় নষ্ট করল না তখন তখনই রাস্তার পাশেই বসে পড়ে। প্যাকেটটা মাঝখানে রেখে তারা সেটাকে ঘিরে বসে পড়ল। এরকম ভাবে খেতে হলে সবসময় কাড়াকাড়ি করে কে কার আগে কত বেশি খেতে পারে সেটা নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা হয়। আজকে সেরকম কিছু হলো না, তারা কাড়াকাড়ি করল না, একটু একটু করে খেল। সিদ্ধ ডিমটা জেবা সমান তিনভাগ করে দিল, সেটা তারা আলাদা করে খেল। গোশতের টুকরোগুলো অনেকক্ষণ ধরে চিবাল, হাড়ের টুকরোগুলো চুষে চুষে খেল। প্যাকেটটার শেষ ভাতটাও তারা ঝেড়েপুছে খেয়ে শেষ করল।

মায়া হাত চাটতে চাটতে বলল, "আমি যহন বড় হমু তখন পেরতেক দিন বিরানি খামু।"

সে বড় হলে কেন তার প্রত্যেকদিন বিরিয়ানি খাওয়ার মতো ক্ষমতা হবে সেটা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করল না। তিনজন ওঠে দাঁড়াল, জেবা বিরিয়ানির ডেকচির পাশে বসে থাকা কালো মোটা মানুষটাকে বলল, "পানি খামু।"

জালাল হাত চাটতে চাটতে বলল, "হাত ধুমু।"

মানুষটা কয়েক সেকেন্ড তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ভিতরে যা। হাত ধুয়ে পানি খায়া বিদায় হ।"

তিনজন ভেতরে ঢুকল, বেসিনে রগড়ে রগড়ে সাবান দিয়ে হাত ধুলো, ট্যাপ থেকে পানি খেল তারপর বের হয়ে এলো। আসার সময় জালাল সাবানের টুকরোটা পকেটে করে নিয়ে এলো।

বিরিয়ানির দোকান থেকে নিয়ে আসা সাবানটা দিয়ে জালাল পরের দিন স্টেশনের পাশের ডোবাটাতে গোসল করল, তারপর তার নতুন কাপড় পরল। জিনসের প্যান্ট আর শার্ট পরে সে যখন স্টেশনে ফিরে এলো তখন তাকে দেখে চেনা যায় না। স্টেশনের সবাই তাকে ঘিরে খানিকটা বিস্ময় আর অনেকখানি ঈর্ষা নিয়ে তাকিয়ে থাকে। জালালের একটু লজ্জা লজ্জা করছিল, কৈফিয়ত দেওয়ার মতো করে বলল, "বাড়ি যামু তো হের লাগি কিনছি।"

জেবা সবাইকে জানাল, "জালাইল্যা খালি নিজের কাপড় কিনে নাই—হের মায়ের লাইগাও শাড়ি কিনছে।"

মায়া বলল, "তার বইনের জামাও কিনছে।"

জালাল ভয়ে ভয়ে ছিল জেবা আর মায়া তার বিরিয়ানি খাওয়ানোর কথাটাও সবাইকে বলে দিবে কি না। তাহলে অন্যেরা হই হই করতে থাকবে। জেবা আর মায়ার বুদ্ধি আছে তারা বিরিয়ানি খাওয়া নিয়ে কিছু বলল না।

জেবা বলল, "হের মায়ের শাড়িটা আমি কিনা দিছি।"

মায়া মাথা নাড়ল, "অনেক সোন্দর।"

জালালকে তখন শাড়িটা দেখাতে হলো আর সবাই তখন মাথা নেড়ে স্বীকার করল যে শাড়িটা আসলেই খুবই সুন্দর।

জয়ন্তিকার প্যাসেঞ্জারদের কাছে যখন সবাই ছোটাছুটি করছে তখন জালাল ট্রেনের ছাদে গিয়ে উঠল। হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ, ব্যাগের ভিতর তার মায়ের শাড়ি আর বোনের ফ্রক। এই এক ট্রেনে সে বাড়ি যেতে পারবে না—দুইবার ট্রেন বদলাতে হবে, শেষ অংশ যেতে হবে বাস কিংবা টেম্পুতে। ট্রেনের অংশটুকু ফ্রি, বাস টেম্পুতে কিছু পয়সা খরচ হবে।

ঠিক যখন হুইসেল দিয়ে ট্রেনটা ছেড়ে দিচ্ছে তখন হাঁচড়-পাঁচড় করে মজিদ আর শাহজাহানও ট্রেনের ছাদে ওঠে পড়ল। জালাল অবাক হয়ে বলল, "তোরা কই যাস?"

"তরে একটু আগাইয়া দেই।"

"ফিরতি দেরি হবে কিন্তু, লোকাল টেরেনে ফিরতি হবি।"

শাহজাহান বলল, "সমিস্যা নাই। দরকার হলি কাল ফিরুম।"

কথাটা সত্যি, তারা এই স্টেশনে থাকে তার অর্থ এই নয় যে প্রতি রাতেই তাদের এখানে থাকতে হবে। যখন যেখানে খুশি তারা রাত কাটাতে পারে।

জালাল খুশি হলো, একা একা ট্রেনে যাওয়া থেকে কয়েকজন মিলে যাওয়া অনেক নিরাপদ। ট্রেনের ছাদে বসে যারা যাতায়াত করে তার মাঝে অনেক রকম মানুষ থাকে—কয়দিন আগেই একজন আরেকজনের সবকিছু কেড়ে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছিল।

ট্রেনটা ছেড়ে দেবার পর প্রথম একটু হেলতে দুলতে যেতে থাকে তারপর ধীরে ধীরে তার গতি বাড়তে থাকে। শহরের ভেতর দোকানপাট বাড়িঘর ঘিঞ্জি রাস্তা পার হয়ে দেখতে দেখতে ট্রেনটা গ্রামের ভেতর চলে আসে। দুই পাশে

ধান ক্ষেত, বাঁশঝাড়, ছোট ছোট নদী—দেখে জালাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বাড়ি থেকে পালিয়ে স্টেশনে থাকতে শুরু করার আগে সেও এরকম একটা গ্রামে থাকত, যতবার এরকম একটা গ্রাম চোখে পড়ে জালালের মন কেমন কেমন করে।

শাহজাহান ট্রেনের ছাদে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। মজিদ পকেট থেকে একটা আমড়া বের করে কামড়ে কামড়ে খেতে শুরু করে। জালাল জিজ্ঞেস করল, "মজিদ, তোর বাড়িতে কে কে আছে?"

মজিদের মনে হয় উত্তর দেবার ইচ্ছে নেই, বলল, "জানি না।"

"জানিস না?"

"এই তো। বাপ মা ভাই বুন–"

"তয় তুই বাড়ি যাস না কেন?"

"আমার বাপ হইছে আজরাইল—মাইরতে মাইরতে শেষ করে দেয়।"

"ও।" জালাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার বেলায় ঘটনাটা ঠিক তার উল্টো। যতদিন বাবা বেঁচে ছিল কোনো ঝামেলাই ছিল না, তাকে কত আদর করত। বাবা মরে যাবার পর চাচাদের অত্যাচারে আর বাড়ি থাকতে পারল না।

শাহজাহান ট্রেনের ছাদে শুয়ে শুয়ে আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "মেঘগুলারে মনে হয় জ্যান্ত। মনে লয় এইগুলা হাটে, লড়াচড়া করে।"

জালাল আর মজিদও আকাশের দিকে তাকাল, আকাশে তুলার মতোন মেঘ, কয়দিন আগেও কী সাংঘাতিক বর্ষা ছিল এখন বর্ষা শেষ হয়েছে, সামনে শীত। বর্ষাকালে তাদের কষ্ট, শীতেও তাদের কষ্ট। মাঝখানের এই সময়টাতে তাদের আরাম। শাহজাহানের দেখাদেখি জালাল আর মজিদও ট্রেনের ছাদে শুয়ে শুয়ে আকাশের মেঘ দেখতে লাগল। শাহজাহান ঠিকই বলেছে, একটা মেঘকে মনে হচ্ছে ঘোড়ার মতন, সেটা দেখতে দেখতে প্রজাপতির মতোন হয়ে গেল একটু পরে সেই প্রজাপতিটাকে একটা মুরগির রানের মতো দেখাতে থাকে। মনে হচ্ছে একটা বিরিয়ানির প্যাকেট থেকে এই মুরগির রানটা বের হয়ে এসেছে!

শাহজাহান আর মজিদ দুই স্টেশন পর ট্রেন থেকে নেমে একটা লোকাল ট্রেনের ছাদে রওনা দিয়ে দিল। মজিদ রাত্রে টিএন্ডটি বস্তিতে থাকে, কাজেই সে ফিরে যেতে চাইছিল।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে জালাল সন্ধ্যার মাঝে বাড়ি পৌঁছে যেত কিন্তু সে বাড়ি পৌঁছাল পরের দিন সকালে। মাঝখানে ট্রেনটা এক জায়গায় তিন ঘণ্টা আটকে থাকল, একটা মালগাড়ি উল্টে সবকিছু বন্ধ হয়ে ছিল। তিনঘণ্টা দেরি হওয়ার কারণে পুরো সময়টা উলটপালট হয়ে তার সবকিছু দেরি হয়ে গেল। মাঝ রাতে ট্রেন থেকে নেমে তাকে স্টেশনে রাত কাটাতে হলো—সেটা এমনিতে তার জন্যে কোনো সমস্যা না কিন্তু মাত্র নতুন শার্ট প্যান্ট কিনে এনেছে, প্লাটফর্মে শুয়ে সেগুলো ময়লা করতে চাচ্ছিল না– তাই একটা বেঞ্চে হেলান দিয়ে আধোঘুম আধোজাগা অবস্থায় রাতটা কাটিয়ে দিল।

জালাল সকালে প্রথম বাসটাতে ওঠে বসে—দুই ঘণ্টার মাঝে বাড়ি পৌঁছে যায়। বাস থেকে নেমে ক্ষেতের আল ধরে মাইলখানেক হাঁটার পর সে তার বাড়ি পৌঁছাল, এক বছরের বেশি হলো সে তার মা'কে দেখে না, মা কেমন আছে কে জানে। ছোট বোনটা কি তাকে চিনবে? যখন সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে তখন বোনটা খুব দুর্বল হয়েছিল। খেতে না পারলে দুর্বল তো হবেই।

বাড়ির কাছাকাছি এসে জালালের একটু ভয় ভয় করে। বাইরে বাংলা ঘর, পার হয়ে ঢোকার পর সেখানে উঠান, চারপাশে তাদের চাচাদের ঘর। উঠানের মাঝখানে আসার পর তার একজন চাচাতো ভাই প্রথম তাকে দেখতে পেল। গলা উঁচিয়ে বলল, "আরে! এইটা জালাইল্যা না?"

জালাল মাথা নাড়ল। চাচাতো ভাই জালাল থেকে অনেক বড়। কাছে এসে বলল, "তুই কোন দুইন্যা থেকে হাজির হলি?"

জালাল কী বলবে বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তখন বাড়ির ভেতর থেকে তার কয়েকজন চাচি, চাচাতো ভাইবোন বের হয়ে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। জালাল তাদের ভেতর তার মা'কে খুঁজল, পেল না। তখন জিজ্ঞেস করল, "মা কই?"

সবাই কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। বড় চাচি বলল, "তোর বইন যখন মরল–"

জালালের মাথাটা কেমন যেন চক্কর দিয়ে ওঠে। তার বোন মরে গেছে? যার জন্যে একটা লাল টুকটুকে ফ্রক কিনে এনেছে সে মরে গেছে? জালাল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ করে জালাল কোনো কথা আলাদা করে শুনতে পায় না। একসাথে সবাই কথা বলছে, তার বোনটা কেমন করে মারা গেছে সবাই সেটা বলছে কিন্তু কিছুই জালালের মাথায় ঢুকছে না। একজন মানুষ মরে গেলে সে কীভাবে মারা গেল সেটা জানলেই কী আর না জানলেই কী?

কিন্তু তার মা? তার মায়ের কী হলো? জালাল তখন আবার চারিদিকে সবার মুখের দিকে তাকাল, তারপর জিজ্ঞেস করল, "আর মা? মা কই?"

সবাই হঠাৎ করে চুপ করে যায়। বড় চাচি বলল, "তোর বইনটা যখন মরল তখন তোর মা খালি কান্দে—" এইটুকুন বলে বড় চাচি থেমে যায় মনে হয় কী বলবে বুঝতে পারে না।

মেজো চাচি বলল, "তুইও নাই। তোর মা একলা একলা থাকে। কান্দাকাটি করে।"

বড় চাচি বলল, "মুরুব্বিরা কইল, একলা থাকা ঠিক না–"

মেজো চাচি বলল, "তখন, তখন,—" বাক্যটা শেষ করতে পারল না মেজো চাচি থেমে গেল।

তখন ছোট একটা বাচ্চা আনন্দে হি হি করে হেসে বলল, "তখন বিয়া দিয়া দিছে!"

জালাল কথাটা শুনে বিশ্বাস করতে পারল না, বলল, "বিয়া?"

একবার বিষয়টা বলে দেয়ার পর কথা বলা সহজ হয়ে গেল। বড় চাচি বলল, "হ। জামাইয়ের অবস্থা বালা। বয়স একটু বেশি। তর মাও তো আর কমবয়সী ছেমরি না—"

মেজো চাচি বলল, "আগের বউয়ের বয়স হইছে, দেখনের একটা মানুষও তো লাগে—"

জালাল শুকনো গলায় বলল, "বিয়া? মায়ের বিয়া দিছ? আমার মায়ের?"

ঠিক কী কারণ কে জানে ছোট একটা বাচ্চা হি হি করে হেসে উঠল আর জালাল তখন দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতে সে তখন উঠান থেকে ছুটে বের হয়ে যায়—বাংলাঘরের পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে সে একেবারে সড়কের পাশে গেল, তারপর সেই সড়কের একপাশে বসে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। বোনটা মারা গেছে সেজন্যে কাঁদছে, না মাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে সেজন্যে কাঁদছে, সে নিজেও জানে না।

তার পিছু হাঁটতে হাঁটতে এবং দৌড়াতে দৌড়াতে বেশ কিছু বাচ্চা এসে হাজির হয়েছে। তাদের জন্যে জালালের ফিরে আসাটা অনেক বড় ঘটনা। তারা জালালের থেকে একটু দূরে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে তাকে লক্ষ্য করতে থাকে।

বেশ খানিকক্ষণ পর জালাল চোখ মুছে একটু শান্ত হলো। তখন মুখ তুলে সে বসে থাকা বাচ্চাগুলোর দিকে তাকাল। তার একজন চাচাত বোন বলল, "কান্দিস না। কাইন্দা কী লাভ?"

"আমার বইনরে কই কবর দিছে?"

"পুস্কুনি পাড়ে।"

"বাবার কবরের লগে?"

"হ।"

"আর মায়ের বিয়া?"

"কচুখালি।"

জালাল মাথা নাড়ল। কচুখালি কাছাকাছি একটা গ্রাম। কচুখালি গ্রামের মানুষ একটু বোকা ধরনের হয় বলে সবাই জানে।

"বিয়ার সময় মা কি কানছিল?"

চাচাতো বোন মাথা নাড়ল, বলল, "হ। অনেক কানছিল। বিয়া করবার চায় নাই। জোরে বিয়া দিছে।"

"কেন বিয়া দিল? বিয়া দেওনের কী দরকার হইছিল?"

জালালের কথার কেউ উত্তর দিল না।

দুপুরবেলা জালাল হেঁটে হেঁটে পাশের কচুখালি গ্রামে হাজির হলো। তার মায়ের যার সাথে বিয়ে হয়েছে তার নাম আসাদ্দর আলী। আসাদ্দর আলী এমন কিছু গণ্যমান্য মানুষ না—কচুখালি গ্রামের মতো ছোট একটা গ্রামেও মানুষজন তাকে ভালো চিনে না। শেষ পর্যন্ত গ্রামের এক কোণায় একটা ডোবার সামনে জালাল আসাদ্দর আলীর বাড়িটা খুঁজে পেল, তার বড় চাচি বলেছিল অবস্থা ভালো কিন্তু দেখে সেটা মনে হলো না। বাড়ির সামনে দুইটা হাড়জিরজিরে গরু বেঁধে রাখা আছে। কয়েকটা বাচ্চা কাদামাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে খেলছে।

জালাল কিছুক্ষণ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক কীভাবে এই বাড়ি থেকে তার মা'কে খুঁজে বের করবে বুঝতে পারছিল না। ঠিক তখন ভেতর থেকে একজন বুড়ো মানুষ হুকো খেতে খেতে বের হয়ে এলো। জালালকে দেখে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কারে চাও?"

"আমার মায়েরে।"

"তোমার মা কেডা?"

জালাল ঠিক বুঝতে পারল না সে কীভাবে মায়ের পরিচয় দিবে। এ বাড়িতে আসাদ্দর আলীর সাথে বিয়ে হয়েছে বলতে তার কেমন জানি লজ্জা লাগল। এই বুড়ো মানুষটাই আসাদ্দর আলী কী না কে জানে। আমতা আমতা করে বলল, "আমার মা—আমার মা—হের নাম—" জালাল হঠাৎ করে

আবিষ্কার করল সে তার মায়ের নাম জানে না। তখন বাধ্য হয়ে তাকে বলতেই হল, "এই বাড়িত বিয়া হইছে—"

তখন হঠাৎ করে মানুষটা জালালের মা'কে চিনতে পারল। সে মাথা নাড়তে নাড়তে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল এবং একটু পরেই জালাল দেখল তার মা সবুজ রঙের একটা শাড়ি পরে বের হয়ে এসেছে। শুকনো মুখ, চোখেমুখে একধরনের ক্লান্তির ছাপ। জালালকে দেখে মা কেমন যেন চমকে উঠল, কাছে এসে অবাক হয়ে বলল, "জালাল! তুই?"

জালাল মাথা নাড়ল। তার খুব ইচ্ছা করছিল মা'কে জাপটে ধরে কিন্তু সে পারল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মা কাছে এসে তার হাত ধরে বলল, "বাবা! তুই বাইচা আছস? আমারে যে সবাই কইল তুই মইরা গেছস?"

জালাল মাথা নাড়ল, বলল, "না। মরি নাই।"

মা জালালের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল তারপর হঠাৎ শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। জালালও তখন তার মা'কে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। মা কাঁদতে কাঁদতে তার বোনের কথা বলতে লাগল, কেমন করে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে কাঠির মতো হয়ে গিয়েছিল তখন বড় বড় চোখে শুধু তাকিয়ে থাকত। মারা গিয়ে সে শান্তি পেয়েছে কাঁদতে কাঁদতে ঘুরে ফিরে সেই কথাটাই বারবার করে বলল।

একটু পর কান্না থামিয়ে মা জালালকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কই থাকস? কী করস? তোর চিন্তায় বাবা আমার মনে কুনো শান্তি নাই।"

"তুমি আমার লাগি চিন্তা কইর না। আমি ভালা আছি।"

"কই থাকস?"

স্টেশনের প্লাটফর্মে একটা কুকুরকে জড়িয়ে ঘুমায় কথাটা বলতে জালালের লজ্জা করল। তার কী হলো কে জানে, হঠাৎ করে বলে ফেলল, "আমি একজনের বাড়িতে থাকি মা।"

"কার বাড়ি?"

একটা মিথ্যা কথা বললে আরো অনেক মিথ্যা কথা বলতে হয়। তাই সে মিথ্যা বলতে শুরু করল, "স্কুলের মাস্টারনি। আমারে নিজের ছেলের মতো দেখে।"

"সত্যি?" আনন্দে মায়ের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। "তোরে আদর করে?"

"অনেক আদর করে।"

"মাস্টারনির জামাই কী করে?"

"ঢাকা শহরে চাকরি করে।"

"বাড়ি থাকে না?"

"না। ছুটি হইলে আহে।"

"খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয় না তো?"

"কী বল মা। কুনু কষ্ট নাই। কুনোদিন মাছের ছালুন, কুনোদিন মুরগির গোস্ত—খাওয়ার কুনো কষ্ট হয় না।"

মা জালালের মুখে হাত বুলিয়ে বলল, "এতো খাওয়া দাওয়া হলে স্বাস্থ্যটা আরো ভালা হয় না কেন?"

"কয়দিন আগে জ্বর হইছিল, হেইজন্যে মনে হয় শুকনা লাগে।"

মা বোকাসোকা মানুষ। কোনো সন্দেহ না করে জালালের কথা বিশ্বাস করে ফেলল। জালাল তখন পলিথিনের ব্যাগ থেকে মায়ের শাড়িটা বের করে দিল, বলল, "মা এইটা আনছি তোমার লাগি।"

মা অবাক হয়ে বলল, "আমার লাগি?"

"হ মা।"

"টেহা কই পাইলি?"

জালাল ইতস্তত করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তখন মা নিজেই বলল, "মাস্টারনি কিন্যা দিছে?"

জালাল জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "হ।"

মা শাড়িটা খুলে দেখল, নীলজমিনের উপর কমলা রংয়ের ফুল ফুল শাড়িটা দেখে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল, বলল, "মাস্টারনির মনটা খুব ভালা?"

"হ।"

"তুই মাস্টারনিরে কী ডাকস?"

"খালা।"

"তোরে ছেলের মতো আদর করে—তুই মা ডাকস না ক্যান?"

"শরম করে।"

"শরমের কী আছে? মা ডাকবি।"

"ঠিক আছে।"

"মাস্টারনির আর ছেলে মেয়ে নাই?"

"আছে, আরো দুইটা মেয়ে আছে।"

"কী নাম?"

একটুও দেরি না করে জালাল বলল, "বড়জনের নাম জেবা, ছোটজন মায়া।"

মা মাথা নাড়ল, বলল, "তাগো সাথে রাগারাগি মারামারি করস না তো?"

জালাল একটু হাসল, বলল, "মাঝেমধ্যে একটু করি। আবার মিলমিশ হয়া যায়।"

"তরে স্কুলে পাঠায় না?"

"পাঠাইবার চায়। সব সময় স্কুলে যাবার কথা বলে।'

"তুই যাইবার চাস না?"

জালাল মাথা নাড়ল, "না।"

"ক্যান?"

"লেখাপড়া ভালা লাগে না।"

মা তখন লেখাপড়ার গুরুত্ব নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলল, "তারপর বলল, "স্কুলে যাবি। অবশ্যি স্কুলে যাবি।"

জালাল বলল, "ঠিক আছে মা। যামু।"

মা তখন জালালের শার্ট প্যান্টটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বলল, "এই জামাকাপড় তোর খালায় দিছে?"

"হ।"

"তয় একজোড়া জুতা দিল না কেন?"

"দিছে তো। আমার পরবার মন চায় না।"

"জুতা পাও দেয়া অভ্যাস করা দরকার। ভদ্রলোকেরা সবসময় জুতা পরে।"

জালাল মাথা নাড়ল। মা বলল, "বড়লোক আর ছোটলোকের মাঝে পার্থক্য হইল জুতার মাঝে। বুঝছস?"

জালাল মাথা নেড়ে জানাল সে বুঝেছে।

বিকালবেলা জালাল তার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলো। জালাল তার বোনের জন্যে কেনা লাল ফ্রকটাও তার মা'কে দিয়ে দিল। আসাদ্দর আলীর অনেকগুলো ছেলেমেয়ে—কোনো একজনের গায়ে লেগে যাবে। মা তার খালার জন্যে দুইটা পেঁপে দিয়ে দিল—জালাল নিতে চাচ্ছিল না কিন্তু মা জোর করল, জালাল তখন না করল না।

জালাল যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে তাকায়, ডোবার পাশে নারকেল গাছটার নিচে মা দাঁড়িয়ে আছে, অনেক দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে টপ টপ করে মায়ের চোখ থেকে পানি পড়ছে।

জালাল একটু নিঃশ্বাস ফেলল, তার মা কয়দিন বাঁচবে কে জানে—কিন্তু যে কয়দিনই বাঁচুক মনের মাঝে একটা শান্তি থাকবে, তার ছেলেটা খুব ভালো আছে। কোনো একজন মহিলা নিজের ছেলের মতো আদর করে তাকে বড় করছে। এইটা সত্যি না হলে কী আছে? মা জানবে এটা সত্যি।

জালাল ফিরে যাবার সময়ে পেঁপে দুইটা নগদ বারো টাকায় বিক্রি করে ফেলল।

৭.

রিকশা থেকে নামতে নামতে ইভা টের পেল অসম্ভব শীত পড়েছে। এই দেশে এতো শীত পড়তে পারে সে কখনো কল্পনাই করতে পারে না। বড় একটা সোয়েটার পরেছে তার উপর একটা ভারি কোট। একটা স্কার্ফ দিয়ে মাথা মুখ সবকিছু ঢেকে রেখেছে তারপরও সে ঠকঠক করে কাঁপছে। রিকশা দিয়ে আসার সময় হুডটা হাত দিয়ে ধরেছিল, মনে হচ্ছিল বরফের ছুরি দিয়ে হাতটাকে কেউ ফালি ফালি করে কেটে ফেলছে। গত সপ্তাহেও বোঝা যায়নি এরকম ঠাণ্ডা পড়বে, মাঝখানে হঠাৎ একটু বৃষ্টি হলো তারপর থেকে এরকম ঠাণ্ডা। আজ সকাল থেকে কুয়াশায় সূর্যটা ঢেকে আছে, বাতাসটা কেমন জানি ভেজা ভেজা, দুপুর হয়ে গেছে এখনো সূর্যটার দেখা নেই। একটুখানি রোদের জন্যে ইভার সারা শরীর আঁকুপাকু করতে থাকে।

স্টেশনে ঢোকার সময় ইভা বাচ্চাগুলোকে খুঁজল, এই শীতে তাদের কী অবস্থা কে জানে। আশেপাশে কেউ নেই, কিন্তু একটু পরেই নিশ্চয়ই সবাই এসে হাজির হবে।

ইভা প্লাটফর্মের এক কোণায় হেঁটে যায়, হিল হিল করে কোথা থেকে জানি ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, সেই বাতাস থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তার ইচ্ছে করছিল ওয়েটিং রুমের ভেতরে ঢুকে অপেক্ষা করে, কিন্তু গিঞ্জি ঘরের ভেতরে তার ঢোকার ইচ্ছে করল না। তাছাড়া সেখানেও যে কোনো ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢুকবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই।

ইভা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দুই হাত ঘষে হাত দুটো একটু গরম করার চেষ্টা করল তারপর মুখের কাছে এনে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল, মনে হয় নিঃশ্বাসের সাথে সাথে নাক মুখ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। ইভা প্লাটফর্মের চারিদিকে তাকায়, আজকে মানুষজন বেশ কম। অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়েছে বলেই

হয়তো কেউ বের হয়নি। ইভা দুই নম্বর প্লাটফর্মের দিকে তাকাল এবং হঠাৎ করে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল।

তিন চার বছরের কুচকুচে কালো একটা ছেলে দুই নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে, তার শরীরে একটা সুতো পর্যন্ত নেই। এই ভয়ঙ্কর শীতে পুরোপুরি উদোম গায়ে এই বাচ্চাটি উদাসমুখে দাঁড়িয়ে আছে—অবিশ্বাস্য একটি দৃশ্য। ইভা হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, এটি কেমন করে সম্ভব? সে এতোগুলো গরম কাপড় পরে ঠকঠক করে কাঁপছে, তার মাঝে এই তিন-চার বছরের বাচ্চা কেমন করে ন্যাংটা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? বাচ্চাটি কার? মা বাবা কই? তার ঠাণ্ডা লাগে না কেন?

ঠিক এরকম সময় সে দূর থেকে বাচ্চাদের আনন্দধ্বনি শুনতে পেল, "দুই টেকি আপা! দুই টেকি আপা।"

দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা বাচ্চা তাকে ঘিরে ফেলল। বাচ্চাগুলো নানা ধরনের ময়লা জাব্বাজোব্বা পরে আছে, তবে সবারই খালি পা। ছোট কয়েকজনের নাক থেকে সর্দি ঝুলে আছে। ইভার কাছাকাছি এসে নাকে টান দিয়ে সর্দিটা ভেতরে টেনে নিল, একটু পর আবার সর্দিটা বের হয়ে নাকের সামনে ঝুলতে থাকে, বিষয়টি নিয়ে বাচ্চাগুলোর খুব একটা মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

মায়া তার ফোকলা দাঁত বের করে একটা হাসি দিয়ে বলল, "আমরা পেরতম আফারে চিনতি পারি নাই।"

ইভা যেভাবে শীতের জন্যে জাব্বাজোব্বা পরেছে তাকে চেনার কথা না। সে বলল, "কী শীত পড়েছে, দেখেছ?"

বাচ্চাগুলো মাথা নাড়ল, বলল, "জে আপা। অনেক শীত।"

ইভা দুই নম্বর প্লাটফর্মের ন্যাংটা কুচকুচে কালো ছেলেটাকে দেখিয়ে বলল, "ঐ বাচ্চাটার ঠাণ্ডা লাগে না—এতো শীতে গায়ে কোনো কাপড় নাই, দেখেছ?"

সবাই একসাথে হই হই করে উঠল, বলল, "ঐটা কাউলা।"

"কাউলা? ওর নাম কাউলা?"

জেবা মাথা নেড়ে বলল, "হের কুনো নাম নাই।"

"নাম নেই?"

"জে না। এর মা ফাগলি, হেরে কুনো নাম দেয় নাই।"

"মা কোনো নাম দেয়নি?"

"জে না।"

"ওর ঠাণ্ডা লাগে না?"

"জে না, হের ঠাণ্ডা গরম কিছু নাই। হে কথাও কয় না।"

ইভা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কথাও বলে না?"

"জে না। হেরে কিছু জিগাইলে হে খালি চায়া থাকে।"

"ওর মা কোথায়?"

একজন দূরে সিঁড়ির দিকে দেখাল, "হুই যে ঐখানে থাকে। ফাগলি।"

ইভা জানতে চাইল, "এখন কী আছে?"

বাচ্চাগুলো মাথা নাড়ল, বলল, "জানি না।"

"একটু দেখে আসি।"

ইভা তার ব্যাগটা হাতে নিয়ে রেল লাইনগুলো পার হয়ে দুই নম্বর প্লাটফর্মে গেল। তাকে ঘিরে অন্যান্য বাচ্চারাও সেখানে হাজির হলো। কালো বাচ্চাটা এক ধরনের উদাস দৃষ্টিতে তাদের সবার দিকে তাকিয়ে থাকে। ইভা একটু কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?"

বাচ্চাটা কোনো কথা না বলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। ইভার কথাটা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো না। ইভা আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার ঠাণ্ডা লাগে না?"

বাচ্চাটি এবারেও কোনো কথা বলল না। মজিদ দাঁত বের করে হি হি করে হাসল, বলল, "এর মা ফাগলি আর হে ফাগল!"

পাগলের সাথে ঠাট্টা তামাশা করার সবারই সবসময় একটা অধিকার আছে সেটা প্রমাণ করার জন্যেই মজিদ বাচ্চাটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল এবং সেটা দেখে সবাই আনন্দে হি হি করে হেসে উঠল। ইভা হা হা করে ওঠে বলল, "কী হলো? কী হলো? ওকে ফেলে দিলে কেন?"

ইভা বাচ্চাটাকে তোলার জন্যে এগিয়ে যায় কিন্তু তার আগেই বাচ্চাটা নিজেই ওঠে দাঁড়াল। তাকে দেখে মনে হলো কিছুই হয়নি এবং চারপাশের লোকজন তার সাথে দেখা হলেই তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিবে সেটাই সে নিয়ম হিসেবে ধরে নিয়েছে।

ইভা মজিদের দিকে তাকিয়ে একটু কঠিন গলায় বলল, "কাজটা ঠিক হয়নি। ছোট একটা বাচ্চাকে শুধু শুধু ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে কেন?"

জেবা মজিদকে সাহায্য করার চেষ্টা করল, বলল, "কাউলাকে মারলেও হে দুখ পায় না। আপনি দেখবার চান? দেখামু?"

ইভা হা হা করে উঠল, বলল, "না, না! দেখাতে হবে না।"

শাহজাহান বলল, "হের মা যখন মারে কাউলা কান্দে না।"

"তার মানে না যে তোমরাও ওকে মারবে।"

ইভাকে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চাগুলো মনে হলো তার কথা শুনে একটু অবাক হলো, কিন্তু কেউ কিছু বলল না। যে মানুষ দেখা হলেই দুই টাকা দিয়ে দেয় তার কথাগুলো মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। শুধু জালাল মাথা নেড়ে, বলল, "ঠিক আছে।"

ইভা জালালের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি ওকে দেখে রাখবে?"

দেখে রাখা মানে কী এবং কীভাবে একটা পাগলি মায়ের ছেলেকে দেখে রাখতে হয় জালাল সেটা বুঝতে পারল না। তারপরও সে মাথা নাড়ল, বলল, "রাখমু আপা।"

"শুধু ওকে না, তোমাদের সবার সবাইকে দেখে রাখতে হবে। বুঝেছ?"

ওরা কে কী বুঝল কে জানে কিন্তু সবাই গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল। ইভা তখন তার ব্যাগ খুলে সবাইকে তাদের পাওনা দুটি টাকা ধরিয়ে দিতে থাকে। পাগলি মায়ের উদোম ছেলেটার দিকেও সে দুই টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দেয়, সাথে সাথে সে খপ করে টাকাটা নিয়ে হাতটা মুঠি করে ফেলল যেন কেউ তার টাকাটা নিয়ে নিতে না পারে।

টাকা পাবার পর একজন একজন করে সবগুলো বাচ্চা এদিক-ওদিক সরে পড়ল শুধু জালাল ইভার কাছাকাছি থেকে গেল। ইভা জালালকে জিজ্ঞেস করল, "এই বাচ্চাটাকে একটা কাপড় দিলে কেমন হয়?"

জালাল মাথা নাড়ল, "লাভ নাই।"

"লাভ নেই?"

"না, হে কিছু বুঝে না।"

"তবু একটু চেষ্টা করে দেখি। কী বল?"

জালাল মাথা নাড়ল। ইভা তখন তার ব্যাগ খুলে সেখান থেকে একটা চাদর বের করে, চাদরটা ভাঁজ করে একটু ছোট করে সে বাচ্চাটার গায়ে ভালো করে জড়িয়ে দিল। ছোট বাচ্চাটা মনে হলো বেশ আগ্রহ নিয়ে পুরো ব্যাপারটা লক্ষ করল তারপর শরীর থেকে চাদরটা খুলে নিয়ে সেটাকে ধরে টেনে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। ইভা আর জালাল পিছু পিছু গেল, দেখল বাচ্চাটি চাদরটাকে মাটির সাথে ঘষতে ঘষতে টেনে নিয়ে সিঁড়ির নিচের দিকে যাচ্ছে। সেখানে গুটিশুটি মেরে তার মা বসে আছে, শীতে জবুথবু, চোখের দৃষ্টি অপ্রকৃতস্থ। ছোট বাচ্চাটি চাদরটা নিয়ে তার মায়ের গায়ে ফেলে দেয়, তার মা সাথে সাথে

চাদরটা তার গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নড়েচড়ে বসে বিড়বিড় করে নিজের মনে কথা বলতে লাগল। তাকে দেখে মনে হলো এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে তার তিন চার বছরের উদোম বাচ্চাটি একটা চাদর এনে তাকে সেটা দিয়ে ঢেকে দেবে। মা'কে চাদর দিয়েই বাচ্চাটি চলে গেল না, গোঙানোর মতো একটা শব্দ করল তারপর মুঠি করে ধরে রাখা দুই টাকার নোটটা তার মায়ের দিকে ছুড়ে দিল। মা নোটটা ধরে উল্টেপাল্টে দেখে তার পায়ের নিচে চাপা দিয়ে রেখে আবার কথা বলতে থাকে।

ইভা কী করবে বুঝতে না পেরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সরে আসে, চাপা একটা বোটকা গন্ধ, বেশিক্ষণ থাকাও সম্ভব না। জালাল বলল, "কামটা ঠিক হয় নাই।"

"কোন কাজটা ঠিক হয় নাই?"

"আফনের এতো সোন্দর চাদরটা ফাগলিরে দিলেন। ফাগলি এইটারে নষ্ট করব।"

"গায়ে দেবে। গায়ে দিলে তো নষ্ট হয় না। ব্যবহার হয়।"

"কিন্তুক আফনের চাদর–"

"আমার আরো চাদর আছে। এটা পুরানো একটা চাদর এমন কিছু না।"

ইভা তারপর রেল লাইন পার হয়ে আবার তার নিজের প্লাটফর্মে ফিরে আসে, জালালও তার পিছু পিছু আসে। হাঁটতে হাঁটতে ইভা জিজ্ঞেস করল, "তোমার মিনারেল ওয়াটারের বিজনেস কেমন হচ্ছে?"

জালাল উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করল। একটু পরে মাথা তুলে বলল, "আফা, আফনে কী আমারে ঘিন্না করেন?"

"ঘেন্না? কেন ঘেন্না করব কেন?"

"এই যে আমি চুরি চামারি করি। ভুয়া মিনারেল ওয়াটার বেচি।"

ইভা জালালের মুখের দিকে তাকাল, তার কাচুমাচু অপরাধী মুখ দেখে হঠাৎ তার কেমন জানি এক ধরনের মায়া হয়। এই বাচ্চাগুলোর এখন বাবা-মা ভাইবোনের সাথে থাকার কথা, স্কুলে লেখাপড়ার কথা, রাত্রে বাসার ভেতরে ছাদের নিচে ঘুমানোর কথা। তার বদলে এরা খোলা আকাশের নিচে থাকে, একটু খানি পেট ভরে খাবার জন্যে চুরি চামারি করে, ঝগড়াঝাটি করে আবার সে জন্যে নিজেকে অপরাধীও ভাবে!

ইভা জালালের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "না। আমি তোমাকে মোটেও ঘেন্না করি না।" তারপর কী মনে হলো কে জানে, এই বাচ্চাটা কথাটার অর্থ

ভালো করে বুঝবে না জেনেও বলল, "আমি জানি তুমি যদি ভালো করে বেঁচে থাকার সুযোগ পেতে তাহলে তুমি নিশ্চয়ই চুরি চামারি করতে না। ভুয়া মিনারেল ওয়াটার বিক্রি করতে না।"

জালাল এই গুরুগম্ভীর কথাটা বুঝতে পেরেছে কি না কে জানে, কিন্তু ইভা দেখল সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ছে।

ইভা জালালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাবা-মা ভাইবোন নেই?"

"খালি মা আছে।"

"মায়ের কাছে যাও না?"

"গেছিলাম—" তারপর যে কথাটা সে আর কাউকে বলে নাই সেটা ইভাকে বলে ফেলল, "আমার মায়েরে জুরে বিয়া দিয়া দিছে।"

"তোমার মা'কে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে?"

"জে।"

ইভা কী বলবে বুঝতে পারল না। চুপ করে জালালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। জালাল বলল, "হেইদিন মায়ের সাথে দেখা কইরা আইলাম।"

"কেমন আছেন তোমার মা?"

"ভালা নাই।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি মায়ের মন ভালা রাখনের লাগি তার লগে মিছা কথা কইয়া আইছি।"

"কী মিছে কথা বলেছ?"

"এই তো—" বলে জালাল একটু লজ্জা পেয়ে গেল।

"শুনি কী মিছে কথাটা বলেছ।"

"আমি মায়ের কইছি একজন বড়লোক বেটি আমারে নিজের ছাওয়ালের মতো পালে—" কথা শেষ করে জালাল অপ্রস্তুত ভাবে হি হি করে হাসল।

"তোমার মা তোমার কথা বিশ্বাস করেছে?"

"জে, করছে। আমার মা বোকা কিসিমের। যেইটাই কইবেন সেইটাই বিশ্বাস করে।"

ইভা কী বলবে বুঝতে পারল না, তাই মুখে জোর করে একটু হাসি টেনে এনে মাথা নাড়ল, ঠিক তখন একটা টেলিফোন চলে আসায় ইভাকে কোনো কথা বলতে হলো না, সে টেলিফোনটা ধরল। অফিসের একজনের সাথে সে খানিকক্ষণ কাজের কথা বলল। যতক্ষণ সে কথা বলল ততক্ষণ জালাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল। কথা শেষ হবার পর লাজুক মুখে বলল, "আফা। আমারে আফনার মোবাইল নম্বরটা দিবেন?"

ইভা অবাক হয়ে বলল, "মোবাইল নাম্বার? আমার?"

"জে।"

"কেন? কী করবে?"

"এমনিই। নিজের কাছে রাখুম। মাঝে মাঝে আফনেরে ফোন দিমু।"

"আমাকে ফোন দেবে? কোত্থেকে?"

"মোবাইলের দোকান থিকে।"

ইভা একটু হাসল তারপর ব্যাগ থেকে নিজের একটা কার্ড বের করে উল্টোপিঠে তার মোবাইল টেলিফোনের নম্বরটা লিখে জালালের দিকে এগিয়ে দিল। জালাল কার্ডটা উল্টোপাল্টে দেখে নাম্বারটা পড়ার চেষ্টা করল।

ইভা জিজ্ঞেস করল, "তুমি লেখাপড়া জান?"

"একটু একটু।"

ইভা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে যেখানে কাজ করে সেখানে লেখাপড়ার ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করার উপর তাকে মাঝে মাঝেই বক্তৃতা দিতে হয়। এই বাচ্চাটির সামনে সে যদি লেখাপড়ার গুরুত্ব নিয়ে সেরকম একটা বক্তৃতা দেয় তাহলে সেটা কি একটা বিশাল ঠাট্টার মতো শুনাবে না?

এরকম সময় দূর থেকে ট্রেনটার একটা হুইসিল শোনা গেল। সাথে সাথে জালাল চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে সেলুট দেওয়ার ভঙ্গি করে ইভাকে বলল, "আফা। ট্রেন আইছে। আমি যাই।"

ইভা বলল, "যাও।"

সাথে সাথে জালাল দৌড়াতে থাকে। ইভা দেখল ট্রেনটা প্লাটফর্মে ঢোকা মাত্র জলাল কীভাবে লাফিয়ে চলন্ত ট্রেনটাতে ওঠে পড়ল।

সন্ধ্যেবেলা শীতটা মনে হয় আরো তীব্রভাবে নেমে এলো। স্টেশনের বাচ্চারা তখন শরীর গরম করার জন্যে একটা আগুন জ্বালিয়ে নেয়। সবাই মিলে চারিদিক থেকে কাঠকুটো, কাগজ, গাছের শুকনো ডাল কুড়িয়ে আনে, তারপর সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে আর সবাই গোল হয়ে বসে আগুন পোহাতে থাকে।

আগুনে হাত-পা গরম করতে করতে মায়া জেবাকে বলল, "আফা, একটা গফ করবা।"

জেবা খুশি হয়ে বলল, "কিসের গফ?"

মায়ার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে পেত্নীর গল্প তাই সে বলল, "পেততুনীর।"

"ডরাইবি না তো?"

"না। ডরামু না। কও।"

তখন জেবা সবাইকে একটা পেত্নীর গল্প বলে। তার গ্রামের বাড়িতে পাশের বাড়ির একটা বউ কীভাবে গলায় দড়ি দিয়ে মরে পেত্নী হয়ে গিয়েছিল সেই গল্প। এরপর থেকে অমাবস্যার রাতে সেই পেত্নী বাশ-ঝাঁড়ের নিচে দাঁড়িয়ে থাকত। কেউ যখন সেই বাশ ঝাঁড়ের নিচে দিয়ে যেত তখন একটা বাঁশ নিচু হয়ে তার পথ আটকে দিত। মানুষটা যখন ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত তখন পিছন দিকে আরো একটা বাঁশ নেমে এসে তাকে দুই বাঁশের মাঝখানে আটকে ফেলত। ভোরবেলা দেখা যেত মানুষটা মরে পড়ে আছে। ঘাড়টা ভাঙ্গা আর সারা শরীরে কোনো রক্ত নাই, পেত্নী শুষে সব রক্ত খেয়ে নিয়েছে।

সেই ভয়ংকর গল্প শুনে সবাই শিউরে ওঠে। মায়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, "আফা। সবুজ ভাইও কি ভূত হইছে?"

জেবা মাথা নাড়ল, বলল, "মনে হয় হইছে।"

"হে কী আয়া আমাগো ডর দেহাইব?"

জেবা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল, বলল, "মনে লয় আইতেও পারে। তার হেরোইনের প্যাকেট খুঁজতি আইতে পারে।"

জালাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, সবুজ যদি তার হেরোইনের প্যাকেট খুঁজতেও আসে, আর কোনোদিন সেটা খুঁজে পাবে না।

রাত্রি বেলা সবাই সারি সারি শুয়ে পড়ল। শীত থেকে বাঁচার জন্যে তারা বস্তা জোগাড় করেছে, তার ভেতরে খবরের কাগজ বিছিয়ে সেখানে গুটি গুটি মেরে শুয়ে থাকে। প্রচণ্ড শীতে ঘুম আসতে দেরি হয়, পাশাপাশি শুয়ে একজনের শরীরের উত্তাপ আরেকজন ভাগাভাগি করে নিয়ে কোনোমতে ঘুমানোর চেষ্টা করে।

গভীর রাতে জালালের ঘুম ভেঙে যায়, জেবা তাকে ডেকে তোলার চেষ্টা করছে। চোখ খুলে বলল, "কী হইছে?"

"কলেজের ছেইলে মেয়েরা আইছে।"

জালাল তখন ধড়মড় করে ওঠে বসল, "কম্বল আনছে?"

"মনে লয়।"

প্রত্যেক বছরই যখন খুব শীত পড়ে তখন কলেজের ছেলেমেয়েরা শীতের কাপড়, কম্বল এসব নিয়ে আসে, পথে ঘাটে ঘুমিয়ে থাকা মানুষদের দেয়।

কখনোই বেশি থাকে না সবাইকে দেওয়ার আগেই শেষ হয়ে যায়। তাই কার আগে কে নিতে পারে সেটা নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে যায়।

জালাল তার বস্তা থেকে বের হবার আগেই কলেজের ছেলেমেয়েরা এগিয়ে আসে। একজন বলল, "এইখানে কয়টা বাচ্চা আছে।"

আরেকজন বলল, "গুড। এটা চমৎকার একটা ছবি হবে।"

কলেজের ছেলেমেয়েগুলো তাদের পাশে হাটু গেড়ে বসল। কম বয়সী সুন্দর একটা মেয়ে একটা কম্বল বের করে তাদের দিকে এগিয়ে দেয়। জেবা কম্বলটা ধরে রাখল তখন একজন একটা ছবি নিল। ফ্লাশের আলোতে তাদের চোখ ধাধিয়ে যায়—যে ছবি তুলেছে সে ছবিটা দেখে বলল, "বিউটিফুল!"

জালাল ব্যস্ত হয়ে বলল, "আমারে—আমারে একটা।"

সুন্দর মেয়েটা আরেকটা কম্বল বের করে তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছিল তখন ক্যামেরা হাতে ছেলেটা তাকে থামাল, বলল, "না না, এখানে আর দিও না। স্টেশনের অলরেডি দুইটা ছবি হয়ে গেছে। এখন ফুটপাথের জন্যে রাখ। ফুটপাথের ছবি তুলতে হবে।"

জালাল বলল, "খোদার কসম লাগে—একটা দেন—"

ছেলেটা মাথা নাড়ল, বলল, "আর দেয়া যাবে না।"

তারপর ফুটপাথে কম্বল দেওয়ার "বিউটিফুল" আরেকটা ছবি তোলার জন্যে ছেলেমেয়েগুলো হই হই করে চলে যেতে লাগল।

জালাল মনমরা হয়ে দাঁতের নিচ দিয়ে তাদের একটা গালি দেয়। জেবা হি হি করে হাসল, বলল, "জালাইল্যা—তোরেও মাঝে মাঝে এই কম্বল দিমু। বেজার হইস না।"

জালাল তবুও বেজার হয়ে থাকল। ক্যামেরায় তার ছবিটা যদি সুন্দর আসত তাহলে তাকেই নিশ্চয়ই কম্বলটা দিত!

জেবা, অবশ্যি বেশিদিন কম্বলটা রাখতে পারল না। দুই সপ্তাহের মাঝে সেটা চুরি হয়ে গেল।

৮.

মায়াকে দেখে জালাল অবাক হয়ে বলল, "তোর ঠোঁটে কী হইছে?"

মায়ার ঠোঁট এবং তার আশপাশের বেশ খানিকটা অংশ কটকটে লাল, সে তার কটকটে লাল ঠোঁট ফাঁক করে ফোকলা দাঁত বের করে একটা হাসি দিয়ে বলল, "লিপিস্টিক দিছি।"

বড়লোকের মেয়ে কিংবা বউয়েরা ঠোঁটে লিপস্টিক দেয়, তার সাথে নিশ্চয়ই তাদের মুখের তারা আরো অনেক কিছু দেয়, যে কারণে তাদের দেখতে পরীর মতো সুন্দর দেখায়। মায়ার বেলায় সেটা ঘটেনি, তাকে দেখতে খানিকটা ভয়ংকর দেখাচ্ছে। মায়া জীবনে কখনো ঠোঁটে লিপস্টিক দেয় নি, কেমন করে দিতে হয় সেটা জানে না। তা ছাড়া এটা দেয়ার জন্যে মনে হয় আয়নার দরকার হয়, কোথায় লিপস্টিক লাগানো হচ্ছে সেটা জানা থাকলে ভালো। মায়ার কোনো আয়না নেই, সে আন্দাজে দিয়েছে তাই শুধু ঠোঁট না—ঠোঁটের আশেপাশে বিশাল জায়গা জুড়ে লিপস্টিক থ্যাবড়া হয়ে লেগে আছে।

জালাল জিজ্ঞেস করল, "লিপস্টিক কই পাইছস?"

"একটা বেটি দিছে।"

একজন মহিলা মায়ার মতো ছোট একটা মেয়েকে এতো জিনিস থাকতে লিপস্টিক কেন দিয়েছে জালাল বুঝতে পারল না, সেটা নিয়ে সে মাথাও ঘামাল না। মায়ার অবশ্যি অনেক উৎসাহ তাই সে তার প্যান্টে গুঁজে রাখা লিপস্টিকটা বের করে জালালকে দেখাল। ঢাকনা খুলে নিচে ঘোরাতেই টকটকে লাল লিপস্টিকটা লম্বা হয়ে বের হয়ে আসে, আবার অন্যদিকে ঘুরাতেই সেটা ভেতরে ঢুকে যায়। মায়া কয়েকবার লিপস্টিকটা বের করে আবার ভিতরে ঢুকিয়ে দেখাল। জালাল দেখল, এটা সত্যি সত্যি লিপস্টিক। কোনো একজন মহিলা সত্যি সত্যি মায়াকে একটা লিপস্টিক দিয়েছে।

ঠোঁটে লিপস্টিক লাগানোর কারণেই কিনা কে জানে মায়ার আজকের আয় রোজগার অন্যদিন থেকে বেশি হলো।

মায়ার লিপস্টিক দেখে জালাল যেরকম অবাক হয়েছিল, কয়দিন পর ঠিক সেরকম অবাক হলো জেবার নেলপালিশ দেখে। একদিন রাতে ঘুমানোর আগে আগে জালাল অবাক হয়ে দেখল জেবা গভীর মনোযোগ দিয়ে তার নখে নেলপালিশ লাগাচ্ছে। জালাল জিজ্ঞেস করল, "নউখে কী লাগাস?"

জেবা মুখ গম্ভীর করে বলল "নেইল ফালিশ।"

"কই পাইলি?"

"আমারে দিছে।"

"কে দিছে?"

"একজন বেটি।"

জালাল বলল, "একজন বেটি তরে নেইল ফালিশ কেন দেয়?"

"দিলে তর সমিস্যা আছে?" জেবা মুখ শক্ত করে বলল, "দুই টেহি আফা আমাগো সবাইরে দুই টেহা কইরা দেয় না?"

কথাটা সত্যি, কোনো কিছুই তারা সহজে পায় না। আবার দুই টেকি আপার মতো মানুষও আছে যারা কিছু না চাইতেই দেয়। জালাল জিজ্ঞেস করল, "মায়ারে যে বেটি লিপিস্টিক দিছে তরে কী সেই বেটিই নেল পালিশ দিছে?"

জেবা মাথা নাড়ল, বলল, "হ।"

"আমাগো কিছু দিব না?"

"হেইডা আমি কী জানি?"

"আরেকদিন আইলে আমাগো কথা কইস।"

জেবা বলল, "কমু। তোগো সবাইরে যেন একটা লিপিস্টিক দেয়।" তারপর জেবা হি হি করে হাসতে থাকে।

যেই মহিলা মায়াকে লিপস্টিক আর জেবাকে নেল পালিশ দিয়েছে তার সাথে জালালের দেখা হলো দুইদিন পর। প্লাটফর্মের এক মাথায় সেই মহিলা মায়া আর জেবার সাথে কথা বলছে। মায়ার হাতে ঢলঢলে কয়েকটা চুড়ি, জেবার গলায় একটা প্লাস্টিকের মালা। কিছু একটা নিয়ে কথা হচ্ছে এবং সেই কথা শুনে মায়া আর জেবা দুইজনই হি হি করে হাসছে। মহিলাটির বয়স বেশি না, শক্ত সমর্থ গঠন, পান খেতে খেতে পিচিক করে প্লাটফর্মের পাশের দেয়ালে পানের পিক ফেলে কী একটা বলল তখন মায়া আর জেবা দুইজনই আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল।

জালালকে আসতে দেখে তিনজনই হাসি থামিয়ে দেয়। জালাল কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হইছে? হাসির ব্যাপার কী হইছে?"

মহিলাটি মুখ শক্ত করে ফেলল, মায়া কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল জেবা ঝপ করে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তোর হেইডা জাননের দরকার কী?"

এরকম একটা সহজ প্রশ্নের এরকম কঠিন একটা উত্তর শুনে জালাল একটু থতমত খেয়ে যায়। সে আস্তে বলল, "জাননের কুনো দরকার নাই, এমনি জিগাইলাম।"

জালাল মহিলাটার দিকে তাকাল, পান খেয়ে দাঁতগুলো কালচে হয়ে আছে, মুখের কশে পানির পিকের চিহ্ন। পান চিবুতে চিবুতে মহিলাটি জালালের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। জালাল বলল, "মায়া আর জেবারে এতো কিছু দিলেন, আমাগো কিছু দিবেন না?"

মহিলাটি পিচিক করে আরেকবার পানের পিক ফেলে বলল, "তরে কেন দিমু?"

"হ্যগো কেন দিলেন?"

"হ্যাগো ভালা পাইছি হের লাগি দিছি।"

"আমাগো ভালা পান নাই?"

মহিলা মাথা নাড়ল, বলল, "না।" আর এই কথা শুনে মায়া আর জেবা হি হি করে হেসে উঠল।

জালাল তখন আর সময় নষ্ট করল না। মায়া আর জেবাকে সেই মহিলার সাথে রেখে সে ফিরে যেতে শুরু করল। খানিক দূর যেতেই সে আবার তিনজনের হাসি শুনতে পায়। সে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, তার দিকে তাকিয়েই হাসছে, কী নিয়ে হাসছে কে জানে। অকারণেই জালালের মেজাজটা গরম হয়ে গেল।

সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল মায়া আর জেবা খুব যত্ন করে নিজেদের নখে নেল পালিশ দিচ্ছে। শুধু তাই না তারা চিরুণী দিয়ে তাদের চুল আচড়াল এবং একটা আয়না দিয়ে নিজেদের চেহারা দেখল। জালাল জিজ্ঞেস করল, "আয়না কই পাইলি?"

"জরিনি খালা দিছে।"

কিছু বলে না দিলেও জালাল বুঝতে পারল যে মহিলাটি তাদের লিপস্টিক নেল পালিশ, চুড়ি আর মালা দিয়েছে সেই হচ্ছে জরিনি খালা। জালাল জিজ্ঞেস করল, "তোগো জরিনি খালার মতলবটা কী?"

"কুনো মতলব নাই।"

"আছে।"

"নাই।"

"মতলব না থাকলে তোগো লিপিস্টিক নেইল ফালিশ আয়না চিরুণী দেয় কেন? আমাগো তো দেয় না।"

জেবা মুখ শক্ত করে বলল, "তোগো ভালা পায় না হের লাগি দেয় না।"

জালাল বড় মানুষের মতো বলল, "হেইডাই চিন্তার বিষয়। আমরা হগগলে এক লগে থাকি কিন্তু তোর জরিনি খালা খালি তোগো দুইজনরে ভালা পায়, আর কাউরে ভালা পায় না।"

জেবা কোনো উত্তর না দিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল। এতোদিন তারা সবাইকে রুক্ষ উশকুখুশকো লাল চুলে দেখে এসেছে—হঠাৎ করে পরিপাটি চুল দেখে জেবা আর মায়াকে কেমন জানি অচেনা অচেনা লাগে।

জালাল বলল, "তোরা কিন্তু সাবধান।"

জেবা মুখ ভেংচে বলল, "কিসের লাগি সাবধান?"

"তোর জরিনি খালা কিন্তু ছেলে ধরা হতি পারে।"

মায়া ভয়ে ভয়ে বলল, "ছেলে ধরা হলি সমস্যা কী? আমরা তো মেয়ে।"

জালাল হি হি করে হাসল, বলল, "ছেলে ধরা খালি ছেলেদের ধরে না, মেয়ে ছাওয়ালরেও ধরে।"

মায়া এইবার ভয়ে ভয়ে জেবার দিকে তাকাল, বলল, "আফা, জরিনি খালা কি ছেলে ধরা?"

জেবা বলল, "ধুর! জরিনি খালা ছেলে ধরা হবি ক্যান?"

"জরিনি খালা যে হুই সময় বলল আমাগো—" মায়ার কথা শেষ হবার আগে জেবা মায়ার মুখ চেপে বলল, "চোপ! কিছু বলবি না।"

জালাল বলল, "কী বলিছে? তোগো জরিনি খালা কী বলিছে?"

জেবা মুখ শক্ত করে বলল, "কিছু বলে নাই। তোগো সেটা শুনারও দরকার নাই।"

এর পরের কয়েকদিন মায়া আর জেবা একটু আলাদা আলাদা থাকল, অন্যদের সাথে বেশি কথা বলল না। এমন কি বৃহস্পতিবার যখন দুই টেকী আপা সবাইকে দুই টাকা করে দিল তখন তারা সেটা নিয়েই আলাদা হয়ে গেল। ট্রেন এলে প্যাসেঞ্জারদের সাথে বেশি দৌড়াদৌড়িও করল না। মাঝে মাঝে তাদের জরিনি খালার সাথে গুজগুজ ফুসফুস করতেও দেখা গেল।

জালাল স্পষ্ট বুঝতে পারল মায়া আর জেবা জরিনি খালাল সাথে কোনো একটা কিছু করতে যাচ্ছে—কী করতে যাচ্ছে সে এখনো বুঝতে পারছে না, কিন্তু কিছু একটা যে করবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

জালালের সন্দেহে কোনো ভুল নাই। দুইদিন পরে যখন জয়ন্তিকা ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে আর জালাল ট্রেনের পাশে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তখন সে হঠাৎ করে দেখল জরিনি খালা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। জালাল চমকে উঠল আর অবাক হয়ে দেখল ট্রেনের ভিতর জরিনির পিছনে মায়া গুটি গুটি মেরে বসে আছে– তার পাশে আরেকজন, চেহারা দেখতে না পারলেও জালালের বুঝতে বাকি থাকল না সেটা হচ্ছে জেবা। জরিনি খালা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে প্লাটফর্মের দিকে তাকিয়ে রইল আর ঝিক ঝিক শব্দ করে ট্রেনটা জালালের সামনে দিয়ে চলে যেতে লাগল।

জালালের হাতে কয়েকটা মিনারেল ওয়াটারের বোতল। তার কিছুক্ষণ লাগল বুঝতে যে জরিনি খালা নামের এই মহিলাটা জেবা আর মায়াকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে?

দেখতে দেখতে ট্রেনটা এত জোরে ছুটতে শুরু করল যে জালাল বুঝতে পারল সে আর কিছু করতে পারবে না। তার নিজের ভেতরে হঠাৎ এক ধরনের ভয় কাজ করতে শুরু করে। এখন কী হবে? মায়ার কী হবে? জেবার কী হবে?

হঠাৎ জালালের কী হল কে জানে সে হাত থেকে তার পানির বোতলগুলি ফেলে দিয়ে ট্রেনের সাথে সাথে ছুটতে থাকে। সে অসংখ্যবার চলন্ত ট্রেনে উঠেছে, অসংখ্যবার চলন্ত ট্রেন থেকে নেমেছে কিন্তু এতো জোরে ছুটতে থাকা ট্রেনে কখনোই ওঠেনি। কেউ কখনো উঠতে পেরেছে কি না সে জানে না।

জালাল মাথা থেকে সব চিন্তা দূর করে পাগলের মতো ছুটতে থাকে, প্লাটফর্ম শেষ হবার আগে তার এই ট্রেনে উঠতে হবে, একবার প্লাটফর্ম শেষ হয়ে গেলে আর সে উঠতে পারবে না। ছুটতে ছুটতে সে একটা খোলা দরজার হ্যান্ডেলের দিকে তাকাল, সে যদি হ্যান্ডেলটা একবার ধরতে পারে তাহলেই শেষ একটা সুযোগ আছে। একবার চেষ্টা করল, পারল না, জালাল তবু হাল ছাড়ল না। সে শুনতে পেল ট্রেনের ভেতর থেকে মানুষজন চিৎকার করছে, "কী কর? কী কর? এই ছেলে? মাথা খারাপ না-কি?"

জালাল কিছু শুনল না, ছুটতে ছুটতে আরেকবার চেষ্টা করে হ্যান্ডেলটা ধরে ফেলল। হাতটা ফস্কে যেতে যাচ্ছিল কিন্তু জালাল ছাড়ল না। তার পা দুটি তখনো প্লাটফর্মে, প্রাণপণে সে প্লাটফর্মের উপর দিয়ে ছুটে যেতে থাকে। এবারে লাফ দিয়ে তার পা দুটো পাদানিতে তুলতে হবে, পাদানিতে পা তোলার

আগে পর্যন্ত শরীরের পুরো ভারটুকু থাকবে তার হাতের উপর। তখন যদি হাত ফসকে যায় তাহলে সে সোজা ট্রেনের চাকার নিচে চলে যাবে।

অনেক মানুষ চিৎকার করছে, জালাল তার কিছুই শুনল না। সে হ্যান্ডেলটা দুই হাতে শক্ত করে ধরে রেখে একটা লাফ দিল এবং পা দুটো সে পাদানিতে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। জালালের পা শূন্যে ঝুলে যায়, সে হাতে একটা হ্যাচকা টান অনুভব করল, আর সাথে সাথে তার সারা শরীরটা একটা বস্তার মতো ঘুরপাক খেয়ে বগীর দেওয়ালে প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়ল, ট্রেনের ভেতর থেকে সে অসংখ্য মানুষের আর্ত চিৎকার শুনতে পেল।

জালাল তখন হ্যান্ডেলটা ধরে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে। সে ঝুলতে ঝুলতে তার পা দুটি পাদানিতে রাখার চেষ্টা করে। কানের খুব কাছে দিয়ে একটা সিগন্যাল লাইটের পোস্ট বের হয়ে গেল, আরেকটু হলে সেটাতে ধাক্কা খেয়ে সে নিচে ছিটকে পড়ত। প্রথমবার পাদানিতে পা রাখতে পারল না, তখন সে ঝুলে থাকা অবস্থায় আবার চেষ্টা করল, এবারে একটা পা রাখতে পারল—সাথে সাথে জালালের বুকে পানি আসে, সে হয়তো এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেছে। খুব সাবধানে সে তার অন্য পা টাও পাদানিতে রেখে দুই পায়ের উপর ভর দিল—একটু আগে মনে হচ্ছিল হাতটা ছিড়ে যাচ্ছে, আর বুঝি সে ঝুলে থাকতে পারবে না, সেই ভয়ংকর অনুভূতিটা দূর হবার পর জালাল বুঝতে পারে বুকের ভেতর তার হৃৎপিণ্ডটি ধক ধক করে শব্দ করছে এবং এই প্রথম সে ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের চিৎকার আর গালাগালি শুনতে পায়। তার শার্টের কলার ধরে হ্যাচকা টান দিয়ে একজন তাকে ভেতরে তুলে আনে তারপর চুলের মুঠি ধরে তার গালে রীতিমতো একটা চড় বসিয়ে দেয়, চিৎকার করে বলে, "বদমাইসের বাচ্চা! আরেকটু হলে ট্রেনের চাকার নিচে চলে যেতি, সেইটা জানিস?"

জালাল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল, সে এটা জানে। কিন্তু মায়া আর জেবাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানতে হলে তার এটা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না। যতক্ষণ সবাই মিলে তাকে বকাবকি করল ততক্ষণ সে মাথা নিচু করে সেগুলো শুনে গেল। সবাই মিলে রাগারাগি করলেও এই রাগারাগির ভেতরে কোথায় জানি তার জন্যে একটুখানি মমতা আছে, এতো এই রাগারাগির বিপদ থেকে সে বেঁচে গিয়েছে সে জন্যে একটা স্বস্তি আছে তাই গালাগালটুকু সে একেবারেই গায়ে মাখল না। যখন গালাগাল একটু কমে এল তখন সে আস্তে করে সরে পড়ল।

সে এখন মায়া, জেবা কিংবা জরিনি খালার চোখে পড়তে চায় না। তারা এই ট্রেনে আছে এটা সে জানে, তারা কোথায় নামে, কোথায় যায় সেটা সে

জানতে চায়। খুব সাবধানে সে সামনের বগির দিকে এগিয়ে যায়। মাঝামাঝি একটা বগিতে সে মায়া, জেবা আর জরিনি খালাকে খুঁজে পেল। তারা তিনজন একটা ট্রেনের সিটে বসেছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে টিকেট কিনে এই সিটে বসতে হয়েছে। জরিনি খালা মোবাইল টেলিফোনে কথা বলছে। জেবা আর মায়া জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখে মুখে একটু একটু ভয় আর একটু একটু উত্তেজনার ছাপ।

জালাল সেই বগি থেকে সরে এসে ঠিক আগের বগিতে বাথরুমের সামনের খোলা জায়গাটাতে গুটি গুটি মেরে বসে রইল। যখনই ট্রেনটা কোথাও থামে সে উঁকি মেরে দেখে জরিনি খালা মায়া আর জেবাকে নিয়ে নেমে পড়ছে কী না। যখনই ট্রেন থামছে তখনই জরিনি খালা স্টেশনের ফেরিওয়ালার কাছ থেকে মায়া আর জেবাকে চিনাবাদাম, ঝালমুড়ি এইসব কিনে কিনে দিচ্ছিল কিন্তু কেউ ট্রেন থেকে নামল না।

ট্রেনটা যখন শেষ পর্যন্ত ঢাকা পৌঁছাল তখন জরিনি খালা মায়া আর জেবাকে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। জরিনি খালা এক হাতে একটা কালো ব্যাগ, অন্য হাতে মায়ার হাত ধরে জরিনি খালা ভিড় ঠেলে এগুতে থাকে—জেবা তাদের পিছু পিছু যেতে থাকে। গেটে টিকেট কালেক্টরকে টিকেট দেখিয়ে তিনজন বের হয়ে এলো। জালালের মতো রাস্তার বাচ্চাদের কাছে কেউ কখনো টিকেট চায় না—সে ভীড়ের সাথে বের হয়ে এল। একটু দূর থেকে জালাল তিনজনকে অনুসরণ করতে থাকে, স্টেশনের অনেক মানুষের মাঝেও সে তাদের চোখে চোখে রেখে এগুতে থাকে।

স্টেশন থেকে বের হয়ে জরিনি খালা মোবাইল টেলিফোনে খানিকক্ষণ কথা বলল, তারপর আবার এগিয়ে গেল। প্লাটফর্মে রিকশা, স্কুটার দাঁড়িয়ে আছে এখন যদি জরিনি খালা মায়া আর জেবাকে নিয়ে এগুলোতে ওঠে যায় তাহলে জালাল কী করবে চিন্তা করে পেল না। তখন অন্য একটা রিকশা না হয়ে স্কুটারে ওঠে তাকে বলতে হবে জরিনি খালাদের রিকশা বা স্কুটারের পিছু পিছু যেতে। তার কাছে মনে হয় রিকশা কিংবা স্কুটার ভাড়া হয়ে যাবে কিন্তু কেউ তার কথা শুনবে না। তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিবে।

জালালের কপাল ভালো জরিনি খালা রিকশা স্কুটারে উঠল না, মায়া আর জেবাকে নিয়ে সামনে হাঁটতে থাকে। মায়া আগে কখনো ঢাকা শহরে আসেনি তাই অবাক হয়ে এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে জরিনি খালার হাত ধরে হাঁটতে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে তারা একটা বাস স্টেশনে এসে দাঁড়াল, মনে হচ্ছে তিনজন এখান থেকে বাসে উঠবে। তিনজন ওঠে যাবার পর জালাল একই বাসে উঠে যেতে পারে কিন্তু তাকে দেখে ফেললে সমস্যা হয়ে যাবে। চেষ্টা করতে হবে ভেতরে না ঢুকে দরজা থেকে ঝুলে থাকতে।

জরিনি খালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাসগুলো লক্ষ করে। প্রথম কয়েকটি বাসের নম্বর দেখে সে সেগুলোতে ওঠার চেষ্টা করল না। তখন একেবারে ভাঙাচুরা একটা বাস এসে দাঁড়াল, হেলপার নেমে ফকিরাপুল, ফার্মগেট, কাকলী, উত্তরা, টঙ্গী বলে চিৎকার করতে থাকে তখন জরিনি খালা মায়ার হাত ধরে সেই বাসে ওঠে পড়ে। তাদের পিছু পিছু জেবাও বাসে ওঠে পড়ল। জালাল লোকজনকে আড়াল করে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইল, ঠিক যখন প্যাসঞ্জারের বোঝাই করে বাসটা ছেড়ে দিল তখন জালাল লাফিয়ে বাসটাতে উঠতে গেল। কিন্তু হেলপার ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল, বাসে উঠতে দিল না। তার চেহারা পোশাক দেখে হেলপারের মনে হয়েছে সে নিশ্চয়ই বাসে ওঠে ভাড়া দিতে পারবে না।

বাসটা চলেই যাচ্ছিল এবং জালাল প্রায় হাল ছেড়েই দিচ্ছিল তখন বাসের পিছনে বাম্পারটা তার চোখে পড়ল। লাফ দিয়ে সে বাম্পারটাতে ওঠে দাঁড়িয়ে যেতে পারে, বাম্পার থেকে সে যেন পড়ে না যায় সে জন্যে কিছু একটা হাত দিয়ে ধরে রাখতে হবে, ধরার সেরকম কিছু নেই—তবে ভাঙা ব্যাকলাইটটা কষ্ট করে ধরে রেখে মনে হয় সে ঝুলে থাকতে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা বাসের পিছনে কোনো জানালা নেই সে যে এখানে ঝুলে আছে কেউ টের পাবে না।

জালাল চিন্তা করে সময় নষ্ট করল না, দৌড়ে গিয়ে বাসটার বাম্পারের উপর দাঁড়িয়ে গেল। আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল, কোনোমতে ভাঙা ব্যাকলাইটটা ধরে সে তাল সামলে নিল।

ঢাকার ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে বাসটা ছুটতে থাকে, পিছনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা হেলপারটা বাসের গায়ে থাবা দিয়ে চিৎকার করে আশেপাশের গাড়ি, টেম্পু, স্কুটারকে সরিয়ে দিতে থাকে। সে জানতেও পারল না, খুবই কাছাকাছি বিপজ্জনক ভাবে বাম্পারে দাঁড়িয়ে জালাল এই বাসে করেই যাচ্ছে। তাকে উঠতে দিলে বাস ভাড়াটা পেত, এখন সেটাও পাবে না।

প্রত্যেকবার বাসটা থামার আগেই জালাল বাম্পার থেকে নেমে একটু দূরে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল, কে উঠছে সেটা নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই কিন্তু জরিনি খালা মায়া আর জেবাকে নিয়ে নামছে কি না সে দেখতে চায়। বাসটা ছেড়ে দিতেই আবার সে দৌড়ে গিয়ে বাম্পারের উপর দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল—দেখে

মনে হতে পারে এটা খুবই বিপজ্জনক কাজ কিন্তু জালালের কাছে এটা ছিল খুবই সহজ একটা ব্যাপার। এর চাইতে অনেক বেশি বিপজ্জনক কাজ সে খুব সহজে করে ফেলতে পারে। জালাল জানে কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে না দিলে কোনোদিনও সে এখান থেকে পড়ে যাবে না।

টঙ্গির কাছাকাছি জরিনি খালা মায়া আর জেবাকে নিয়ে বাস থেকে নেমে এদিক সেদিক তাকাল। জালাল একটু দূরে মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জরিনি খালা একটু এগিয়ে গিয়ে আবার তার মোবাইল টেলিফোনটাতে কিছুক্ষণ কথা বলল, কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হলো কোনো কারণে সে রেগে গেছে। কথা বলা বন্ধ করে সে এবারে জোরে জোরে হাঁটতে থাকে, মায়াকে মাঝে মাঝে হ্যাচকা টান দেয়, মায়া জরিনি খালার সাথে তাল মিলানোর চেষ্টা করে, আরো জোরে হাঁটার চেষ্টা করে।

খানিকদূর গিয়ে জরিনি খালা রাস্তা পার হলো—বাস, গাড়ি, টেম্পুর ফাঁকে ফাঁকে হেঁটে হেঁটে জরিনি খালা খুব সহজেই ব্যস্ত রাস্তাটা পার হয়ে যায়। রাস্তা পার হয়ে তারা কোনদিকে যাচ্ছে জালাল লক্ষ করল তারপর সেও রাস্তা পার হয়ে এলো।

জরিনি খালা বড় রাস্তা থেকে একটা ছোট রাস্তায় ঢুকে একটা রিকশা ভাড়া করে মায়া আর জেবাকে নিয়ে সেটাতে ওঠে পড়ল। জালাল এবারে একটু বিপদে পড়ে যায়—সে ইচ্ছে করলে আরেকটা রিকশা ভাড়া করতে পারে কিন্তু রিকশাওয়ালাকে সে কী বলবে? কোথায় যাবে? আর ততক্ষণে জরিনি খালা অনেকদূর চলে যাবে—পরে খুঁজেও পাবে না।

তার থেকে মনে হয় রিকশাটার পিছনে পিছনে দৌড়ে যাওয়া সহজ। রাস্তাটা ছোট, আঁকাবাঁকা গলি, কাজেই রিকশাটা খুব জোরে যেতে পারবে না। সে ইচ্ছা করলে মনে হয় একটা রিকশার সাথে দৌড়াতে পারবে। চিন্তা করার খুব সময় নেই তাই সে আর দেরি না করে জরিনি খালার রিকশাটাকে চোখে চোখে রেখে পিছন পিছন দৌড়াতে থাকে।

প্রথম প্রথম রিকশাটা একটু জোরে যাচ্ছিল, তার সাথে তাল মিলিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে জালাল প্রায় হাপিয়ে উঠছিল। একটু পরেই রিকশাটা আরো ছোট ঘিঞ্জি একটা গলিতে গিয়ে ঢুকল, রাস্তাটা খারাপ—তখন রিকশাটা আর জোরে যেতে পারছিল না, জালাল জোরে জোরে হেঁটেই রিকশার পিছনে পিছনে হেঁটে যেতে পারল।

ঘিঞ্জি রাস্তাটা দিয়ে মনে হয় পাশাপাশি দুটো রিকশাই যেতে পারে না—সেখানে একটা পুরোনো বিল্ডিংয়ের সামনে একটা বিশাল ট্রাক

দাঁড়িয়েছিল। রিকশাটা সেখানে দাঁড়িয়ে গেল তখন জরিনি খালা রিকশা ভাড়া মিটিয়ে রিকশা থেকে নামল। কালো ব্যাগটা ঘাড়ে ঝুলিয়ে মায়া আর জেবার হাত ধরে জরিনি খালা বিল্ডিংটার সামনে দাঁড়াল। বিল্ডিংয়ের মুখে একটা কোলাপসিবল গেট, ভেতরে একজন মানুষ টুলে বসেছিল। জরিনি খালা মানুষটার সাথে নিচু গলায় কিছু একটা বলল, মানুষটা তখন গেটটা খুলে দেয়। জরিনি খালা মায়া আর জেবাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে যাবার পর মানুষটা আবার গেটটা বন্ধ করে দিল।

বিল্ডিংয়ের ভেতরে জালাল ঢুকতে পারল না, ঢুকতে পারবে সেটা অবশ্যি সে আশাও করেনি। মায়া আর জেবাকে জরিনি খালা কোথায় নিয়ে আসতে চেয়েছে জালাল শুধু সেটাই জানতে চেয়েছিল, সেটা সে এখন জেনে গেছে। হয়তো জরিনি খালা মায়া আর জেবাকে আসলেই নিজের মেয়ের মতো আদর করে, সেজন্যে হয়তো এখানে নিজের কাছে নিয়ে এসেছে তাহলে জালালের কিছুই করতে হবে না। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জালাল নিজের জায়গায় ফিরে যাবে।

জালাল নিজের মা'কে বুঝিয়েছিল একজন মহিলা তাকে মায়ের মতো আদর করে। তার নিজের জন্যে না হয়ে মায়া আর জেবার জন্যে সেটা তো হতেও পারে! হয়তো সে মিছি মিছি সন্দেহ করে পিছু পিছু এতো দূর চলে এসেছে। আসলে হয়তো জেবা আর মায়া সত্যিকারের মায়ের মতো একটি মা পেয়ে গেছে।

হতেও তো পারে।

৯.

জরিনি খালা সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় ওঠে দরজাটায় ধাক্কা দিতেই ভেতর থেকে একজন মোটা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে?"

জরিনি খালা বলল, "আমি। আমি জরিনা।"

"ও। জরিনা সুন্দরী নাকি?"

"হ। দরজা খুলো।"

খুট করে দরজা খুলে গেল। মায়া আর জেবা দেখল দরজার অন্য পাশে কালো মোষের মতো একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটা খাটো একটা লুঙ্গি আর লাল রংয়ের একটা গেঞ্জি পরে আছে। মায়া আর জেবাকে দেখে মানুষটার চোখ দুটি চকচক করে ওঠে, জিব দিয়ে লোল টানার মতো শব্দ করে বলল, "জরিনা সুন্দরী! তুমি দেখি কামের মানুষ। দুইটা চিড়িয়া আনছ।"

জরিনা কোনো কথা বলল না, হঠাৎ করে জেবার বুকটা কেঁপে উঠল, তার মনে হলো ভেতরে অনেক বড় বিপদ, মনে হলো তার এখন এখান থেকে ছুটে পালাতে হবে কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। জরিনি খালা দুইজনকে দুই হাতে ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে এসেছে আর সাথে সাথে ঘটাং করে পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

জরিনা দুইজনের হাত ধরে ভেতরের আরেকটা ঘরে নিয়ে গেল তখন পেছনের দরজাটা আবার বন্ধ করে দেওয়া হলো।

জেবা ঘরের ভেতরে তাকাল এবং হঠাৎ ভয়ানক ভাবে চমকে উঠল। ঘরের ভেতরে একটা খাট সেখানে একটা ময়লা বিছানা, একপাশে একটা ভাঙ্গা ড্রেসিং টেবিল, একটা টেবিল, সেখানে কিছু খালি খাবারের প্যাকেট, কয়েকটা পানির বোতল। ঘরের একপাশে একটা আধখোলা দরজা সেখান থেকে বোটকা দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। জেবা অবশ্যি এসব দেখে চমকে উঠেনি, সে

চমকে উঠেছে নিচের দিকে তাকিয়ে। মেঝেতে এবং দেওয়ালে হেলান দিয়ে অনেকগুলি বাচ্চা চুপচাপ বসে আছে, বাচ্চাগুলোর চোখে মুখে আতংক। বড় বড় চোখে তারা তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

মায়াও চারিদিকে তাকাল, সেও একই দৃশ্যটা দেখল কিন্তু মনে হলো সে কিছু বুঝতে পারল না। জরিনি খালার দিকে তাকিয়ে বলল, "জরিনিখালা, খিদা লাগছে।"

মনে হলো কথাটা শুনে জরিনি খালার খুব মজা লেগেছে, সে হি হি করে হাসতে থাকে, মনে হয় হাসি থামাতেই পারে না। মায়া বলল, "হাসতাছ ক্যান জরিনি খালা?"

জরিনি খালা বলল, "তোর কথা শুনে। কী খাবি? কোরমা পোলাও না বিরানি?"

মায়া তখনো কিছু বুঝতে পারেনি, সরল মুখে বলল, "বিরানি।"

মায়ার কথা শুনে জরিনি খালা আবার হি হি করে হাসতে শুরু করে। তারপর যেভাবে হাসতে শুরু করেছিল ঠিক সেইভাবে হাসি থামিয়ে ফেলল এবং দেখতে দেখতে তার মুখটা পাথরের মতো থমথমে হয়ে ওঠে। খানিকক্ষণ সে মায়ার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং সেই দৃষ্টি দেখে মায়া ভয় পেয়ে যায়। মায়া ভাঙ্গা গলায় বলল, "জরিনি খালা, তোমার কী হইছে? তুমি ডর দেখাও কেন?"

জরিনি খালা কিছু বলল না, স্থির চোখে মায়ার দিকে তাকিয়ে রইল। মায়া বলল, "তুমি কইছিলা আমাগো নতুন জামা দিবা। বিরানি খাইতে দিবা—"

জরিনি খালা হঠাৎ হুংকার দিয়ে ওঠে বলল, "চুপ কর আবাগীর বেটি। সখ দেইখা বাঁচি না—নতুন জামা লাগবি! বিরানী খাতি হবি! তোগা এখানে আনছি কীসের লাগি এখনো বুঝিস নাই?"

মায়া ফ্যাকাসে মুখে বলল, "কীসের লাগি?"

"তোগো বেচুম। ইন্ডিয়াতে বেচুম। কোরবানি ঈদের সময় গরু ছাগল কেমনে বেঁচে দেখছস? হেই রকম!"

এই প্রথম মনে হলো মায়া ব্যাপারটা বুঝতে পারল, আর্ত চিৎকার করে বলল, "তুমি ছেলেধরা?"

"হ।" জরিনা খালা বুকের মাঝে থাবা দিয়ে বলল, "আমি ছেলে ধরা। ছেলে আর মেয়ে ধরা। আমি তোগো ধরি আর কচমচ কইরা খাই! মাইনষে যেইভাবে মুরগির রান কচমচ কইরা খায় আই হেইরকম তোগো ধইরা কচমচ কইরা খাই।"

জরিনি খালার কথা শুনে মায়া দুইহাতে মুখ ঢেকে ভয়ে চিৎকার করতে থাকে। মায়ার চিৎকারটা মনে হয় জরিনি খালাকে খুব আনন্দ দেয়। সে দাঁত বের করে হি হি করে হাসতে থাকে।

জরিনি খালা একসময় হাসি থামাল তারপর সবার দিকে এক নজর দেখে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। খাটো করে লুঙ্গি আর লাল গেঞ্জি পরা মানুষটা জরিনি খালার পিছু পিছু বের হয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে গেল। ঘর ভর্তি বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোগো কপাল খুব ভালা। ইন্ডিয়াতো আমাগো মাল সাপ্লাই দিবার তারিখ পেরায় শেষ। হের লাগি তোগো আমরা ইন্ডিয়া পাঠামু। তোরা সব দিল্লী, বোম্বাই যাবি!"

মানুষটা বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, এর আগেরবার তোগো মতন আরও দুই ডজন ছাওয়াল মাইয়া আনছিলাম। তাগো কী করিছিলাম জানস?"

কেউ কোনো কথা বলল না। কালো মানুষটা হা হা করে হাসতে হাসতে বলল, "হাত পা ভাইঙ্গা লুলা বানাইছিলাম। ভিক্ষা করনের লাগি লুলার উপরে মাল নাই। চাইর জনের আবার ইস্পিশাল দাবাই দিছিলাম। কী দাবাই কইতে পারবি?"

বাচ্চাগুলোর কেউ কথা বলল না। লাল গেঞ্জি পরা কালো মোটা মানুষটা বলল, "চোখের মাঝে এসিড! এখন আন্ধা ফকির! গান গাতি গাতি ভিক্ষা করে—পেরতেক দিন তাগো কয়টাকা ইনকাম শুনলি তোদের জিব্বার মাঝে পানি চলে আসবি! তোরা কইবি আমি হমু আন্ধা ফকির! আমি হমু আমি আন্ধা ফকির!"

খুবই একটা হাসির কথা বলেছে এই রকম ভান করে মানুষটা হাসতে থাকে। তারপর হঠাৎ হাসি বন্ধ করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল, তারা শুনতে পেল, বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

মায়া জেবার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে কাঁদতে বলল, "আফা খিদা লাগছে।"

এরকম একটা সময়ে যে কারো খিদে লাগতে পারে জেবার বিশ্বাস হলো না। সে কিছু না বলে মায়াকে ধরে রাখে—তার চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়তে থাকে। সে কেমন করে এত বোকা হলো? কেন সে একবারও জালালের কথা শুনল না? কেন সে বুঝতে পারল না জরিনি খালা একটা ভয়ংকর মহিলা?

১০.

চার তালা বিল্ডিংটার সামনে একটা চা বিস্কুটের দোকান। জালাল সেই দোকানটার সামনে চুপচাপ বসে আছে। দুপুরবেলা সে একটা বনরুটি আর একটা কলা খেয়েছে। গরম ভাত খাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সে বিল্ডিংটার সামনে থেকে নড়তে চাচ্ছিল না, তখন তাদেরকে অন্য কোথাও নিয়ে গেলে সেটা সে জানতে পারবে না। চারতালা বিল্ডিংয়ের কয় তালায় তাদেরকে রেখেছে জালাল প্রথমে বুঝতে পারেনি—কিন্তু উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে কয়েকবার জরিনি খালাকে দোতালায় বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করতে দেখেছে—সেখান থেকে আন্দাজ করতে পারছে যে মায়া আর জেবাও নিশ্চয়ই দোতালাতেই আছে। বিল্ডিংয়ের সামনে কলাপসিবেল গেট সেখানে বিশাল একটা তালা ঝুলছে তাই মনে হতে পারে ভেতরে ঢোকার বুঝি কোনো উপায় নেই। তবে জালাল চায়ের দোকানের সামনে বসে থেকেও ভেতরে ঢোকার আরো তিনটা পথ বের করে ফেলল। প্রথম পথটা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের পাশের নারকেল গাছটা দিয়ে। এই গাছটা বেয়ে সে দোতালার কার্নিশে ওঠে যেতে পারে। সেখান থেকে দোতালায় বারান্দায়। দুই নম্বর পথটা হচ্ছে জানালাগুলো দিয়ে। জানালাগুলো নিচু, এই জানালায় পা দিয়ে সে উপরে ওঠে যেত পারবে, সেখান থেকে দোতালায়। এই জানালার থেকে আরো অনেক বিপজ্জনক জানালায় পা দিয়ে সে যখন খুশি তখন চলন্ত ট্রেনে উঠে যায় কাজেই তার জন্যে এটা পানির মতো সোজা। তিন নম্বর পথটা হচ্ছে পানির পাইপ। পাইপগুলো বেয়ে সে খুব সহজেই দোতলার জানালায় ওঠে যেতে পারবে। জানালার কাচ ভেঙে ভেতরে ঢোকা খুব কঠিন হবার কথা নয়।

জালাল অবশ্যি তার কোনোটাই এখন করতে পারবে না। চারিদিকে দিনের আলো, এখন সে যদি বানরের মতো খিমচে খিমচে দোতালায় ওঠার

চেষ্টা করে, তাহলে কারো না কারো চোখে পড়ে যাবে, তারপর যা একটা কাণ্ড হবে সেটা আর বলার মতো না।

কাজেই জালাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। অপেক্ষা করতে করতে সে দেখল এই বিল্ডিংয়ের মাঝে আরো একজন মহিলা আরো একটা বাচ্চার হাত ধরে ঢুকল। মহিলাটার চেহারা মোটেও জরিনি খালার মতো নয় কিন্তু তারপরেও কোথায় যেন দুজনের মাঝে একটা মিল রয়েছে। বাচ্চাটি একটা ছোট গরিব ধরনের ছেলে এবং তার সাথেও মায়ার কোথায় জানি একটা মিল আছে।

বিকেলবেলার দিকে জালাল দেখল বিল্ডিংয়ের সামনে রাখা ট্রাকটার ভেতরে একজন মানুষ এসে খড় বিছাতে শুরু করেছে। ট্রাকে করে যখন গরু নেয় তখন সেখানে এভাবে খড় বিছায়। বেশ পুরু করে খড় বিছিয়ে তার উপর চট বিছানো হলো, তারপর পুরোটা একটা তেরপল দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। খালি একটা ট্রাক তেরপল দিয়ে কেন ঢেকে দেয়া হলো জালাল সেটা বুঝতে পারল না।

অন্ধকার নামার পর জায়গাটা হঠাৎ করে কেমন যেন নির্জন হয়ে গেল। মনে হয় এলাকাটা ভালো না, লোকজন দিনের আলোয় সাহস করে যাওয়া আসা করেছে, রাতের বেলা আর সাহস পাচ্ছে না।

রাত একটু গভীর হওয়ার পর জালাল ঠিক করল সে পাইপ বেয়ে বিল্ডিংটার দোতালায় ওঠে যাবে। দোতালায় ওঠে কী করবে সে এখনো জানে না। মানুষগুলো যদি ভালো হয় তাহলে পাইপ বেয়ে ওঠায় অপরাধ নিশ্চয়ই ক্ষমা করে দেবে। আর মানুষগুলো যদি খারাপ হয় তাহলে তাদের সামনে পড়া ঠিক হবে না। এক নজর দেখেই আবার পাইপ বেয়ে নেমে যেতে হবে।

জালাল পাইপ বেয়ে খুব সহজেই উপরের জানালা পর্যন্ত ওঠে গেল। জানালা ভেতর থেকে বন্ধ, কাচ ভেঙেও লাভ নেই কারণ ভেতরে লোহার গ্রীল। জালাল তখন কার্নিশে পা দিয়ে সাবধানে এগিয়ে এসে বারান্দার দেওয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে গেল। সামনে একটি ঘর, ভেতরে আলো জ্বলছে, মানুষ আছে কী নেই বোঝা যাচ্ছিল না। জালাল খুব সাবধানে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল। ছোট একটা ঘর, একটা টেবিল ঘিরে কয়েকটা চেয়ার। একপাশে একটা পুরোনো আলমারি, দরজা খোলা, ভেতরে নানা ধরনের ময়লা আধা ময়লা জিনিসপত্র। মেঝেতে কয়েকটা কার্টন, একটা খোলা বাক্স। বাক্সে কী আছে বোঝা যাচ্ছে না।

ঘরটায় কেউ নেই ব্যাপারটাতে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে জালাল যখন ভেতরে ঢুকতে যাবে ঠিক তখন পাশের একটা ঘরে পানি ফ্লাশ করার শব্দ হলো আর একজন মানুষ তার প্যান্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে ঘরে ঢুকল। মানুষটা মাঝ বয়সী, উঁচু কপাল, ভাঙা গাল, চোখ দুটি কোটরে ঢুকে আছে। চেয়ারে বসে সে কয়েকবার কাশল, তারপর ডাকল, "মস্তাজ মিয়া।"

মস্তাজ মিয়া নামের মানুষটা কাছাকাছি কোথাও ছিল সে পা ঘষতে ঘষতে ভেতরে এসে ঢুকল। মানুষটা কালো এবং মোটা, খাটো একটা লুঙ্গি এবং লাল রঙের একটা গেঞ্জি পরে আছে। দুপুরবেলা জরিনি খালার সাথে সেও আটকে রাখা বাচ্চাগুলোকে ভয় দেখিয়ে এসেছিল।

মস্তাজ মিয়া তার বগল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "ডাকছেন ওস্তাদ?"

"হ্যাঁ।" গাল ভাঙা মানুষটা বলল, "সবকিছু রেডি?"

"জে ওস্তাদ। ট্রাক রেডি। রাইতেই ডেলিভারি দিমু।"

"কেমনে নিবি?"

"ট্রাকের নিচে খড় বিছায়া দিছি। উপরে চট। সেইখানে সবগুলানরে শোয়াইয়া দিমু। উপরে তেরপল দিয়ে ঢাকা।"

"ট্রাক চালাইব কে?"

"কাদের।"

"হেল্পার?"

"মাজহার।"

"রাস্তা ঠিক আছে?"

"জে। রাস্তা ক্লিয়ার। তারপরেও ধরেন কাদেরের কাছে কিছু ক্যাশ টাকা থাকব। যদি ইমার্জেন্সি হয় পুলিশ বিডিআর ঝামেলা করে তাহলে সাপ্লাই দিব।"

"গুড।" গাল ভাঙা মানুষটা সন্তুষ্টির ভান করে বলল, "ছেলেমেয়েগুলোরে ট্রাকে তুলবি কখন?"

"ধরেন রাত দশটার মাঝে রওনা দিমু। সবগুলারে বান্ধাবান্ধি করতে ধরেন বিশ মিনিট। তুলতে ধরেন আরো পনেরো মিনিট।"

জালাল খুব সাবধানে বুকের ভিতর থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে দেয়। এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। মানুষগুলো আসলেই ছেলেধরা। জালাল বুকের ভিতর ভয়ের একটা কাঁপুনি অনুভব করে।

গালভাঙা মানুষটা কিছু একটা চিন্তা করল, বলল, "ঠিক আছে।" তারপর পকেট থেকে একটা ছোট কাচের শিশি বের করে টেবিলে রাখল। বলল, "এইটা হচ্ছে মার্কেটের সবচেয়ে ভালো মাল। এক ফোটা যদি খায় জোয়ান মানুষ টানা আটচল্লিশ ঘণ্টা ঘুমাবে। ছোট পোলাপানের জন্যে আধা ফোটা। মনে থাকবে?"

মস্তাজ মিয়া নামের কালো মোটা মানুষটা মাথা নাড়ল, "মনে থাকব। একজন আধা ফোটা, তার মানে দুইজনে এক ফোটা।"

"হ্যাঁ। আধা লিটারের পানির বোতলে দশ ফোটা মাল দিবি। ভালো করে ঝাঁকাবি। তারপর সবাইরে দুই চামুচ করে খাওয়াবি।"

"ঠিক আছে ওস্তাদ।"

"মনে রাখিস কিন্তু এই বোতলের মাল অসম্ভব কড়া। একটু বেশি হলে কিন্তু ফিনিস।"

"মনে থাকব ওস্তাদ। আপনি কুনো চিন্তা কইরেন না।"

ভাঙা গালের মানুষটা বলল, "এই যে এই শিশি এইখানে রাখলাম।"

জালাল দেখল শিশিটা টেবিলের উপর রেখেছে। ছোট কাচের একটা শিশি। ভেতরে স্বচ্ছ পানির মতো একটা তরল। ভয়ংকর ধরনের একটা ঘুমের ওষুধ!

এরকম সময়ে পাশের ঘর থেকে একজন মহিলা এসে ঢুকল। চেহারা দেখা যাচ্ছিল না বলে জালাল প্রথমে চিনতে পারেনি কথা বলতেই জালাল বুঝতে পারল, মহিলাটি হচ্ছে জরিনি খালা। জালাল শুনল জরিনি খালা বলছে, "ওস্তাদ, আমারে কিন্তু টাকা কম দিছেন।"

"টাকা কম দেই নাই।"

"আমি দুইটা মাইয়া আনছি। মাইয়ার রেট বেশি।"

"একটা বেশি ছোট।"

"ছোট হইছে তো কী হইছে? মাইয়া হইছে মাইয়া। দেখতে দেখতে বড় হইয়া যাইব।"

ভাঙা গালের ওস্তাদ বলল, "ছোট হইলে ঝামেলা বেশি। কাস্টমার নিতে চায় না।"

"তয় আমারে ফেরত দেন।"

"তুই কী করবি?"

"বগার কাছে বেচুম। বগা লুলা বানাইয়া বিক্রি করব।"

ওস্তাদ বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে তোকে না হয় আরও এক হাজার টাকা দিই।"

"দুই হাজার।"

"এক।"

"দুইয়ের এক পয়সা কম হলে হবি না। আপনি বলেন ওস্তাদ আমি কতোদিন থেকে আপনার জন্যে কাম করি।"

"ঠিক আছে দেড়। আর কথা বলিস না। নগদ দিয়ে দিচ্ছি।"

জরিনি খালা ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে এইবার রাজি হলাম। সামনের বার কিন্তু রাজি হমু না।"

জালাল দেখতে পেল গালভাঙা ওস্তাদ পকেট থেকে একটা মানি ব্যাগ বের করে সেখান থেকে কিছু টাকা বের করে জরিনির হাতে ধরিয়ে দিল, জরিনি টাকাগুলি গুনে নিজের কোমরে গুঁজে নিল।

গালভাঙা ওস্তাদ বলল, "যা, এখন মস্তাজের সাথে হাত লাগা। পোলা মাইয়া গুলানরে খাওয়া দিয়েছিস?"

"জে দুপুরে একবার দিছি। কেউ আর খাইতি চায় না। ভয় পাইছে তো। খালি কান্দে।"

"জোর করে খাওয়া—আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে কিন্তু খাওয়া নাই।"

"ঠিক আছে ওস্তাদ।"

গাল ভাঙা ওস্তাদ দাঁড়িয়ে বলল, "আয় দেখি, পোলা মাইয়া গুলারে একটু দেখে আসি।"

"চলেন।"

তিনজন ঘর থেকে সামনের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। হঠাৎ করে জালাল বুঝতে পারল, সে ছোট একজন মানুষ। কিন্তু তার উপর এখন অনেক বড় দায়িত্ব। তাকে কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু সে কী করবে?

জালাল পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে, অনেকগুলো বাচ্চাকে নেয়া খুব সোজা না, ঘুম পাড়িয়েই নিতে হবে। কিন্তু যদি ঘুম পাড়িয়ে না দেয়া যায়, সবাই যদি চিৎকার চেঁচামেঁচি করে তাহলে বাঁচার একটা উপায় আছে। ঘুমের ওষুধটা যদি পানি দিয়ে পাল্টে দেয়া যায় তাহলে মনে হয় একটা সুযোগ হবে।

জালাল সাবধানে ঘরের ভেতর ঢুকল। টেবিল থেকে শিশিটা নিয়ে সে পাশের বাথরুমে ঢুকে যায়। শিশিটা খুলে ভেতরের তরল পদার্থটা সিংকের

মাঝে ঢেলে ফেলে দেয়—হালকা একটা ঝাঁঝালো গন্ধ তার নাকে এলো। ট্যাপ খুলে পানি দিয়ে শিশিটা একটু ধুয়ে নিয়ে সেখানে পানি ভরে শিশিটার মুখ বন্ধ করে আবার ঘরটাতে ফিরে এসে টেবিলের উপর রেখে দেয় তারপর খুব সাবধানে পা টিপে টিপে পাশের ঘরে ঢুকল। ঘরটা ছোট, মাঝখানে একটা খাট। খাটের উপর নেতিয়ে থাকা তোষক এবং ময়লা চাদর। একটা সবুজ রঙের মশারি উপর থেকে ঝুলছে। জালাল খাটের নিচে ঢুকে গেল।

খাটের নিচে থেকে অন্যপাশের ঘরটা দেখা যাচ্ছে, দরজা খোলা, ভেতরে ওস্তাদ, জরিনি খালা আর মস্তাজ মিয়া ঢুকেছে। তাদের গলার স্বর ছাপিয়ে ছোট বাচ্চাদের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা যেতে থাকে।

জালাল শুনতে পেল মস্তাজ মিয়া একটা হুংকার দিয়ে বলল, "চোপ! না হলে কল্লা টেনে ছিঁড়ে ফেলমু।"

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দটা সাথে সাথে থেমে গেল।

এবারে ওস্তাদের গলার শব্দ শোনা গেল, সে সবাইকে গুনছে, গোনা শেষ করে বলল, "উনিশজন।"

জরিনি খালা বলল, "হ্যাঁ।"

ওস্তাদ বলল, "কুড়িজন ডেলিভারি দিবার কথা। একটা শর্ট পড়ল।"

জরিনা খালা বলল, "পরের বার একটা বেশি দিলেই হবি।" তারপর নিচু গলায় কী যেন বলল, সেটা শুনে সবাই হেসে উঠল।

কিছুক্ষণ পর খোলা দরজা দিয়ে প্রথমে ওস্তাদ পিছু পিছু মস্তাজ মিয়া আর জরিনি খালা বের হয়ে এলো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ওস্তাদ বলল, "আমি গেলাম।"

জরিনি বলল, "আমিও যামু।"

"তুই থাক। মস্তাজরে সাহায্য কর। একলা পারব না। কাল ভোরে যাবি।"

"ঠিক আছে।"

তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে তিনজন সামনের দিকে এগিয়ে যায়। মানুষগুলো সরে যেতেই জালাল খাটের নিচ থেকে বের হয়ে এলো, সে যেটা দেখতে এসেছিল সেটা দেখে ফেলেছে। জরিনি খালা মায়ের মতো আদর করে বড় করার জন্যে মায়া আর জেবাকে আনেনি, তাদেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনেছে বিক্রি করার জন্যে। বাজারে যেভাবে গরু ছাগল বিক্রি হয় তাদেরকে ঠিক এভাবে বিক্রি করা হচ্ছে।

যেভাবে পাইপ বেয়ে উপরে উঠেছিল ঠিক সেইভাবে এখন পাইপ বেয়ে তাকে নেমে যেতে হবে, তারপর বাইরে কাউকে খবর দিতে হবে। তার কথা কেউ শুনতে চাইবে না কিন্তু তাকে জোর করে কথা শোনাতে হবে। যেভাবে হোক।

পা টিপে টিপে বের হবার আগে জালাল হঠাৎ থেমে গেল। ঐ বন্ধ ঘরটাতে উনিশটা বাচ্চা নিশ্চয়ই ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। বেচারি মায়া আর জেবা নিশ্চয়ই এখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার কি একবার ভেতরে ঢুকে তাদের বলা উচিত না যে—ভয় পাওয়ার কিছু নেই—সে বাইরে গিয়ে পুলিশকে খবর দিবে। পুলিশ তাদেরকে উদ্ধার করে নেবে।

জালাল আবার পা টিপে টিপে আগের ঘরে ফিরে এলো। খুব সাবধানে ছিটকিনি খুলে সে দরজাটা একটু ফাঁক করে ভেতরে মাথা ঢোকায়। একটা বড় খাটের উপরে এবং নিচে জড়াজড়ি করে অনেকগুলো বাচ্চা বসে আছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই প্রথমে বাচ্চাগুলো ভয় পেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। জালালকে দেখে হঠাৎ সবাই চুপ করে তার দিকে তাকাল।

জেবা অবাক হয়ে চিৎকার করে উঠতে চাইছিল জালাল ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ করতে বলল, সাথে সাথে জেবা চুপ করে গেল। জালাল পা টিপে টিপে কাছে এসে ফিস ফিস করে বলল, "ডরাইস না।"

"তুই কোত্থেকে আইছস?"

"আমি তোগো পিছ পিছ আইছি। কথা কওনের সময় নাই। আমি বাইরে গিয়া পুলিশরে খবর দিমু।"

সবগুলো বাচ্চা চোখ বড় বড় করে জালালের দিকে তাকিয়ে রইল। জালাল সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "কুনো ভয় নাই। আমি পুলিশরে খবর দিমু।"

মায়া কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন জালাল শুনতে পেল বাইরে মস্তাজ মিয়া বলছে, "এই জরিনা, দরজা খোলা কেন?"

জরিনি খালা বলল, "হেইডাতো জানি না।"

"ভিতরে কে ঢুকছে?"

ধড়াম করে দরজা খুলে মস্তাজ মিয়া আর জরিনি খালা ভেতরে ঢুকল। দুইজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকায়। মস্তাজ মিয়া বলল, "পোলা মাইয়া ছাড়া তো আর কাউরে দেখি না।"

জরিনি খালা বলল, "গুনে দেখ, বেশি আছে কী না।"

মস্তাজ মিয়া গুনতে শুরু করে, উনিশজন ছিল, গুনে দেখা গেল একজন বেশি। গুনতে ভুল করেছে কী না সেটা ভেবে মস্তাজ মিয়া আরেকবার গুনতে শুরু করেছিল তার আগেই জরিনি খালা জালালকে হঠাৎ চিনে ফেলল, চিৎকার করে বলল, "আরে! তুই জালাইল্যা না?"

জালাল কিছু বলার আগেই মস্তাজ মিয়া লাফ দিয়ে এসে জালালের ঘাড় ধরে তাকে টেনে উপরে তুলে ফেলে একটা ঝাঁকুনি দিল। জালালের মনে হলো তার সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল।

জরিনি খালা হি হি করে হেসে বলল, "ওস্তাদরে মিস কল দে! বলতি হবি একটা শর্ট ছিল এখন আর শর্ট নাই। পুরা বিশজন ডেলিভারি দিবার পারমু। একটা বেকুবের বেকুব নিজে আইসা ধরা দিছে।"

জরিনি খালার হাসি আর থামতে চায় না।

১১.

মস্তাজ মিয়া জালালকে পাশের ঘরে নিয়ে মারতে চাচ্ছিল জরিনি খালা তাকে থামাল, বলল, "মারিস না। তোর হাতে মাইর খাইলে ভর্তা হইয়া যাইব। এরে যদি ইন্ডিয়া পাঠাবার চাই তাজা রাখন দরকার।"

জরিনি খালার কথায় যুক্তি আছে, তাই মস্তাজ মিয়া চুলের মুঠি ধরে দুই চারটা ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুই ঢুকলি কেমনে?"

জালাল বলল, বিল্ডিংয়ের পিছনে পাইপ বেয়ে উঠেছে। মস্তাজ মিয়া হুংকার দিয়ে বলল, "মিছা কথা কইবি না। তুই কি টিকটিকির বাচ্চা যে পাইপ বায়া উঠবি?"

জালাল সত্যি কথাটা বলল। সে আসলেই পাইপ বেয়ে উঠেছে। সে যে কোনো দেওয়াল, গাছ বা পাইপ বেয়ে যখন খুশি উঠতে পারে। মস্তাজ মিয়া তখন জানতে চাইল সে কেমন করে এই বিল্ডিংটার খোঁজ পেয়েছে তখন জালাল আবার সত্যি কথাটা বলল, সেই স্টেশন থেকে ট্রেনে তাদের পিছু পিছু এসেছে, বাসে পিছু পিছু এসেছে রিকশায় পিছু পিছু এসেছে। মস্তাজ তখন জানতে চাইল, সে কেমন করে বুঝতে পারল বিল্ডিংয়ের দোতালায় উঠতে হবে। জালাল সত্যি কথাটি বলল, নিচে থেকে সে জরিনি খালাকে এই দোতালার বারান্দায় দেখেছে। মস্তাজ মিয়া তখন জানতে চাইল জরিনি খালা ঢুকেছে বিকালে সে এতোক্ষণ কোথায় ছিল। জালাল আবার সত্যি কথাটা বলল, সে অন্ধকার হয়ে চারিদিক নির্জন হয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। অন্ধকার হবার পর পাইপ বেয়ে উঠেছে। মস্তাজ মিয়া তখন জানতে চাইল সে কখন পাইপ বেয়ে ঢুকেছে? জালাল তখন প্রথম একটা মিথ্যা কথা বলল, "আমি এইমাত্র ঢুকছি। কাউরে না পাইয়া ইদিক সিদিক হাঁটছি—এই দরজাটা বন্ধ দেইখা এইটা খুইলা ঢুকছি।"

মস্তাজ মিয়া চুল ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দেওয়ালে তার মাথাটা ঠুকে হুংকার দিয়ে বলল, "সত্যি কইরা কথা ক।"

জালালা কাতর গলায় বলল, "সত্যি কইতাছি। খোদার কসম। আল্লাহর কিরা।" একটা মিথ্যা কথা বলে আল্লাহ এবং খোদাকে নিয়ে কিরা আর কসম কাটার জন্যে সে মনে মনে খোদার কাছে মাপ চেয়ে নিল।

মস্তাজ মিয়া শেষ পর্যন্ত জালালের কথা বিশ্বাস করে তাকে ঘাড় ধরে এনে দরজার ছিটকানি খুলে ভেতরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল।

দরজাটা বন্ধ হবার সাথে সাথে মায়া আর জেবা এবং তার সাথে সাথে অন্যরাও তাকে ঘিরে ধরল। মায়া ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদছে। চোখের পানি নাকের পানিতে তার মুখ নোংরা হয়ে আছে। জেবার চোখে-মুখে আতংক, মুখ ফ্যাকাসে এবং রক্তহীন। শুকনো মুখে বলল, "অহন কী হইব আমাগো?"

জালাল গরম হয়ে বলল, "তোদের জন্যে এই অবস্থা। আমি একশবার তোগো কই নাই জরিনি খালা ছেলেধরা? আমার কথা তোরা বিশ্বাস করলি না? এই বদমাইস বেটির পিছে পিছে ঢাকা চইলা আইলি?"

জেবা কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে রইল। মায়া ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "জরিনি খালা কইল আমাগো নতুন জামা দিব, পেরতেক দিন বিরানি খাইতি দিব, সোন্দর সোন্দর বিছানা বালিশ দিব, আদর করব-"

জালাল দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "আর তুই সেই কথা বিশ্বাস করলি? বেকুবের বেকুব—"

জেবা দুর্বল গলায় বলল, "অহন গাইল মন্দ কইরা লাভ কি?"

কাছাকাছি বসে থাকা আরেকটা মেয়ে বলল, "আমাগো কী করব?"

জালাল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "নিচে একটা ট্রাক খাড়ায়া আছে, আমাগো সেই ট্রাকে তুলব, ট্রাকে কইরা ইন্ডিয়া নিব।"

জেবা বলল, "আমরা তহন চিল্লাফাল্লা করমু।"

"তেরপল দিয়া ঢাইকা রাখব। ট্রাকের ইঞ্জিনের অনেক শব্দ, কেউ শুনবার পাইব না।"

কাছাকাছি বসে থাকা মেয়েটা বলল, "মানুষগুলান খুব খারাপ, আমাগো জানে মাইরা ফালাইব।"

জেবা বলল, "ইন্ডিয়া নিলে কি আমাগো বাঁচাইয়া রাখব? যেই অত্যাচার করব তার থাইকা মাইরা ফালাইলেই ভালা।"

আশেপাশে বসে থাকা ছেলেমেয়েগুলো নিঃশ্বাস ফেলে, দুই একজন কাঁদতে শুরু করে। জালাল বলল, "কান্দিস না। আমাগো এখনো চেষ্টা করতি হবি।"

"কেমনে চেষ্টা করমু?"

"আমি বলি, তোরা হুন।"

সবাই তখন একটু কাছাকাছি এগিয়ে আসে। বেশির ভাগই মেয়ে—বয়স মায়ার থেকে ছোটও আছে আবার জেবার থেকে এক দুই বছর বেশিও আছে। বেশিরভাগই গরিবের বাচ্চা তবে এক দুইজনকে দেখে মনে হলো বড়লোকের ঘর থেকে এসেছে—এখন আর সেইটা নিয়ে খোঁজ-খবর নেওয়ার সময় নাই।

জালাল বলল, "আমি যেই কথাটা কই সবাই মন দিয়া শুন। কথা বলার বেশি সময় নাই। বাঁচনের একটা উপায়—হগগলের একসাথে থাকন লাগব। বুঝছ সবাই?"

সবাই মাথা নাড়ল। জালাল তখন তাদেরকে বলল খুব কড়া একটা ওষুধ খাইয়ে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হবে—কিন্তু সে সেই ওষুধটা ফেলে সেখানে পানি ভরে রেখেছে, তাই ওষুধটা খাওয়ালেও তারা আসলে ঘুমিয়ে পড়বে না। যখন তাদের ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করে তখন সবাই যেন ভান করে তারা এটা খেতে চায় না কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেন খেয়ে নেয়। এটা খাওয়ার কিছুক্ষণ পর তাদের ঘুমিয়ে পড়ার কথা তাই তারা যেন একটু পরে ঘুম ঘুম ভান করে। ওদেরকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছে জানলে তারা আর তাদের নিয়ে মাথা ঘামাবে না– তখন তারা সবাই মিলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে।

জালালের কথা শুনে সবাই উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তাদের চোখ চকচক করতে থাকে—দুই একজনের মুখে হাসি পর্যন্ত ফুটে ওঠে। জালাল মুখ গম্ভীর করে বলল, "খবরদার কেউ হাসবি না। সবাই মুখ কালা করে রাখবি। তারা যেন টের না পায় আমাগো মাথার মাঝে অন্য বুদ্ধি। বুঝলি?"

সবাই মাথা নাড়ল এবং মুখে ভয় আতংক হতাশা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। জালাল নিচু গলায় বলল, "একটু পরে আমাগো খাবার দিব। তোরা ভান করবি তোগো খাওয়ার ইচ্ছা করছে না—কিন্তু সবাই ঠিক করে খাবি। পেট ভরে খাবি। যদি মাইর পিট করতে হয় দৌড়াদৌড়ি করতি হয় তাহলে শরীলের মাঝে জোর থাকতি হবি।"

সবাই আবার মাথা নাড়ল। গোলগাল চেহারার একটা মেয়ে জেবার থেকে এক দুই বছরের বড় হতে পারে একটু এগিয়ে এসে জালালের হাত ধরে বলল, "তোমার নাম কী?"

"জালাল।"

"জালাল, ভাইটি আমার। তুমি আমারে কথা দাও, তুমি আমারে বাঁচাবে। কথা দাও।"

জালাল অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল, কী বলবে বুঝতে পারল না, একটু ইতস্তত করে বলল, "তোমার কুনো ভয় নাই। আমি তোমারে বাঁচামু। খোদার কসম।"

গোলগাল মেয়েটি জালালের হাত ধরে রাখল আর তার চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়তে থাকে।

কিছুক্ষণ পর জরিনি খালা আর মস্তাজ মিয়া অনেকগুলো খাবারের প্যাকেট নিয়ে ঘরে ঢুকল। মেঝের মাঝে বাক্সগুলো রেখে বলল, "এই আবাগীর বেটাবেটি। খা। যদি ঠিক কইরা না খাস ঠ্যাং ভাইংগা দিমু।"

কেউ কোনো কথা না বলে চুপচাপ বসে রইল।

মস্তাজ মিয়া খেঁকিয়ে উঠল, "কী হইল? কথা কানে যায় না? খা কইলাম।"

এবারে বাচ্চাগুলো একটু নড়ে চড়ে বসে। জেবা সাবধানে একটা প্যাকেট নিজের দিকে টেনে আনে। জরিনি খালা বলল, "দুইজনে একটা কইরা প্যাকেট। কুনো খাবার যেন না থাকে। সব খাবার শেষ করতি হবে। খা।"

বাচ্চাগুলো প্যাকেটগুলো নেয় এবং খেতে শুরু করে। জরিনি খালা বিছানায় বসে তীক্ষ্ণ চোখে সবাইকে দেখে। এদের সবাইকে অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে, পরের বার কোথায় খাবে কী খাবে জানা নেই। এখনই ভালো করে খাওয়া দরকার। তা ছাড়া এদেরকে যে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হবে সেটা খুব খারাপ একটা ওষুধ, খালি পেটে খেলে সমস্যা হতে পারে।

জরিনি খালা আর মস্তাজ মিয়া ভেবেছিল বাচ্চাগুলো খেতে পারবে না— কিন্তু যখন দেখল সবাই চেটেপুটে খেল তখন তারা বেশ অবাক হলো, খুশি হলো আরো বেশি। খাওয়ার পরই তারা আধ লিটারের একটা ছোট পানির বোতল নিয়ে আসে, বোতলটা ভালো করে ঝাঁকিয়ে জরিনি খালা একটা চা চামুচে পানিটা ঢালল। মস্তাজ মিয়া তখন হাতের কাছে যে বাচ্চাটাকে পেল সেটাকে খপ করে ধরে নিয়ে বলল, "হা কর।"

বাচ্চাটি খুব ভালো করে জানে কেন তাকে হা করতে বলা হয়েছে, তারপরও সে অবাক হওয়ার ভান করে বলল, "ক্যান? হা করমু ক্যান?"

মস্তাজ মিয়া উত্তর দেওয়ার কোনো চেষ্টা না করে তার লোহার মতো শক্ত আঙুল দিয়ে তার দুই গালে এতো শক্ত করে চেপে ধরল যে তার মুখটা হা করে খুলে গেল। জরিনি খালা তার চায়ের চামুচ দিয়ে দুই চামুচ পানি তার মুখে ঢেলে দিল। মস্তাজ মিয়া তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "খা। গিলে খা।"

বাচ্চাটি ঢোক গিলল, মস্তাজ মিয়া সন্তুষ্ট হয়ে তখন পরের জনকে ধরে আনল। এই বাচ্চাটিও দুর্বলভাবে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। মস্তাজ মিয়া আর জরিনি খালা মিলে তার মুখেও দুই চামুচ ওষুধ ঢেলে দিয়ে তাকে দিয়ে সেটা ঢোক গিলে খেয়ে ফেলতে বাধ্য করল।

মিনিট দশেকের মাঝেই সবগুলো বাচ্চাকে দুই চামুচ করে ওষুধ খাইয়ে দেয়া হলো—অন্তত মস্তাজ মিয়া আর জরিনি খালা তাই ভাবল। বাচ্চাগুলো জানে এখন তাদের ভান করতে হবে যে তাদের ঘুম পেতে শুরু করছে। তারা সবাই কম-বেশি অভিনয় শুরু করল। একজন ঘরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল, আরেকজন হাঁটুতে মাথা দিয়ে চোখ বন্ধ করল। কয়েকজন মেঝেতে শুয়ে পড়ল। কয়েকজন অন্যজনের কাঁধে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করল।

মস্তাজ মিয়া আরা জরিনি খালা একটু অবাক হয়ে বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। মস্তাজ মিয়া বলল, "এই ওষুধের তেজ দেখি অনেক বেশি। ওস্তাদ কইছিল দশ পনেরো মিনিট পরে ঘুম পাড়ব। এরা তো দেখি সাথে সাথে ঘুম যাচ্ছে।"

জরিনি খালা বলল, "বয়স কম, সেই জন্যে মনে লয়।"

"বেশি ঘুমাইলে ট্রাকে তোলা সমিস্যা হতি পারে। এখনই ট্রাকে তোলা শুরু করতি হবে।"

জরিনি খালা মাথা নাড়ল, বলল, "দেরি করা যাবি না। আমি পাহারা দেই তুমি দুইটা দুইটা কইরা নামাও।"

মস্তাজ মিয়া চওড়া একরোল টেপ নিয়ে আসে, সেখান থেকে খানিকটা ছিঁড়ে তাদের মুখে লাগাল যেন কথা বলতে না পারে তারপর আরো খানিকটা ছিঁড়ে তাদের দুই হাত পিছনে নিয়ে সেখানে লাগাল যেন হাত দুইটা ব্যবহার করতে না পারে। হাত পিছনে বাঁধা থাকলে হঠাৎ করে কেউ দৌড় দিতে পারে না।

মস্তাজ মিয়া তারপর বাচ্চা দুইজনের ঘাড় ধরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে আনে। লাইট নিভিয়ে সবকিছু অন্ধকার করে রাখা আছে তার মাঝে বাচ্চা দুইজনকে ট্রাকে তুলে দেয়া হলো। ট্রাকের ভেতরে একজন বসেছিল সে দুইজনকে ট্রাকের মাঝে উপুড় করে শুইয়ে দিল। বাচ্চা দুটো নাড়াচাড়া করল না, চুপচাপ শুয়ে রইল। মস্তাজ মিয়া বলল, "এক নম্বর ওষুধ। আধা ফোটা ওষুধেই কলাগাছের মতন ঘুম।"

ট্রাকের ভেতরে বসে থাকা মানুষটা বলল, "কথা ভুল কও নাই। সত্যি কথা ছোট পুলাপান বড় যন্ত্রণা করে। একবার ঘুমাইলে শান্তি।"

যে দুইজনকে নিয়ে তারা কথা বলছিল সেই দুইজন কিন্তু আবছা অন্ধকারে চোখ পিট পিট করে সবাইকে দেখছে। তাদের চোখে কোনো ঘুম নেই তারা পুরোপুরি সজাগ হয়ে কিছু একটা করার জন্যে অপেক্ষা করছে।

দুইজন দুইজন করে বিশটি বাচ্চাকে নামিয়ে আনা হলো এবং সবাইকে ট্রাকের ভেতরে খড়ের উপর চটের বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো। শুইয়ে দেওয়ার পর তাদের মুখের আর হাতের টেপ খুলে দেওয়া হলো—সবাই নিশ্চয়ই এতক্ষণে গভীর ঘুমে অচেতন। এখন এগুলার আর দকার নেই।

মস্তাজ মিয়া আবছা অন্ধকারে সারি বেধে শুয়ে থাকা বাচ্চাগুলোকে এক নজর দেখে শেষবারের মতো গুনে ট্রাক ড্রাইভারকে বলল, "কাদের ভাই, এই যে তোমারে আমি কুড়িটা বাচ্চা বুঝায়া দিলাম। এরা যে ঘুম দিছে আগামী চব্বিশ ঘন্টায় সেই ঘুম ভাঙব না। এখন দায়দায়িত্ব তোমার।"

"এক দুইটা মইরা যাইব না তো?"

"হেইডা আমি জানি না।"

"মরলে কিন্তু আমার দোষ নাই।"

মস্তাজ মিয়া মাথা নাড়ল, "না তোমার দোষ নাই। তুমি ওগো ওষুধ খাওয়াও নাই। ওষুধ খাওয়াইছি আমরা। মরলে দায়ী আমরা। যাও। আল্লাহর নাম নিয়া রওনা দাও।"

কাদের ড্রাইভার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আল্লাহ্‌র নাম নিয়া রওনা দিমু? মস্তাজ তোমার কী ধারণা এই বাচ্চাগুলানরে আমরা ইন্ডিয়া পাচার করতাছি হেইডা দেইখাও আল্লাহ কী আমাগো দিকে থাকব?"

মস্তাজ মিয়া ধমক দিয়া বলল, "বড় বড় কথা কওনের দরকার নাই। রওনা দেও। আল্লাহ্‌র নাম নিতি না চাইলে নিও না। যাও।"

তেরপল দিয়ে ট্রাকটা ভালো করে ঢেকে দেওয়ার পর ভেতরের অংশটা কুচকুচে অন্ধকার হয়ে গেল। ট্রাকটা না ছাড়া পর্যন্ত সবাই চুপচাপ শুয়ে রইল, যেই ট্রাকটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করে সাথে সাথে সবাই উঠে বসে যায়। জালাল ফিস ফিস করে বলল, "সবাই ঠিক আছ?"

সবাই গলা নামিয়ে বলল, "আছি।"

অন্ধকারের ভেতর কেউ একজন বলল, "এখন আমরা কী করমু?"

"প্রথমে তেরপলটা একটু খুলতে হবে যেন ভেতর থেকে বের হতে পারি। তারপর অপেক্ষা করতি হবে। যখন ট্রাকটা কুনো জায়গায় থামব আমরা নাইমা দিমু দৌড়।"

"ট্রাকটা কখন থামবি?"

"হেইডা তো জানি না।"

"যদি না থামে?"

"থামবি। নিশ্চয়ই থামবি।"

অন্ধকারে কেউ একজন বলল, "টেরাক ডেরাইভাররা টেরাক থামাইয়া সব সময় চা খায়।"

আরেকজন বলল, "হ। খালি চা না হেরা বাংলা মদও খায়।"

জালাল বলল, "একটা কথা হুনো সবাই।"

"কী কথা?"

"আমরা চেষ্টা করুম গোপনে নামবার। কিন্তু যদি মনে কর তারা দেখি ফেলে তাহলে সবাই দৌড় দিবা।"

"ঠিক আছে।"

"সবাই একদিকে দৌড় দিবা না। একেকজন একেক দিকে।"

"ঠিক আছে।"

"পিছন দিকে তাকাবা না। আল্লাহর নাম নিয়া দৌড় দিবা।"

"ঠিক আছে।"

ট্রাকটা গর্জন করে যেতে থাকে। কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে বোঝার কোনো উপায় নেই। কিন্তু হর্নের শব্দে, হঠাৎ হঠাৎ ব্রেক করা দেখে তারা অনুমান করতে পারে এটা এখনো শহরের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। এর মাঝে ভেতর থেকে তারা তেরপলটা খোলার চেষ্টা করতে থাকে। ভারী শক্ত তেরপল বাইরে দিয়ে বাঁধা, তাই খোলা প্রায় অসম্ভব। চারিদিকে চেষ্টা করে টানাটানি করে ডানদিকে মাঝামাঝি তারা একটা জায়গায় খানিকটা ফাঁক করতে পারল। অনেক চেষ্টা করে তারা খানিকটা তেরপল সরিয়ে মোটামুটি বের হবার মতো খানিকটা জায়গা করে ফেলতে পারল।

এখন শুধু অপেক্ষা করা কখন ট্রাকটা থামবে। কিন্তু ট্রাকটা থামল না যেতেই থাকল, যেতেই থাকল। ভেতরে এক ধরনের ভ্যাঁপসা গরমের মাঝে বাচ্চাগুলি বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। তাদের কারো চোখে ঘুম নেই—সবার বুকের ভেতর চাপা আতংক। শেষ পর্যন্ত তারা সত্যিই পালাতে পারবে তো?

১২.

কাদের ড্রাইভার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "বুঝলি মাজহার কামটা ঠিক কী না বুঝবার পারি না।"

মাজহার নামের হেল্পার ড্রাইভারের পাশে বসে বসে ঝিমাচ্ছিল, কাদের ড্রাইভারের কথা শুনে জেগে উঠল। জিজ্ঞেস করল, "কোন কামটা ওস্তাদ?"

"এই যে ছোটো ছোটো পোলাপানদের ইন্ডিয়া পাচার করি।"

মাজহার তার ময়লা দাঁত বের করে হি হি করে হাসল, বলল, "কী বলেন ওস্তাদ। এই পোলাপানগুলি কি বড় হইয়া জজ বেরিস্টর হইব? এরা তো চোর ডাকাইত ফকিরনিই হইব। তয় এইটা এই দেশে হইলেই কী আর ইন্ডিয়াতে হইলেই কী? মাঝখানে আমাগো কিছু ইনকাম।"

কাদের ড্রাইভার স্টিয়ারিং ধরে একটা লক্কর ঝক্কর বাসকে বিপজ্জনক ভাবে ওভারটেক করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তারপরেও জানি কেমন কেমন লাগে। মনে হয়া কামটা ঠিক হইল না।"

মাজহার কিছু বলল না। তার ওস্তাদের অনেক কথা সে বুঝতে পারে না। তাদেরকে কিছু মাল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে বলেছে—তারা নিয়ে যাচ্ছে। এর মাঝে কোন জিনিসটা অন্যায়? এখন সেই মালটা কী গরুর বাচ্চা না মানুষের বাচ্চা সেইটা নিয়ে তার চিন্তা করতে হবে কেন? ইন্ডিয়ার গরু যখন ট্রাকে করে আনে তখন তো তার ওস্তাদ মন খারাপ করে না।

কাদের ড্রাইভার আরেকটা বাসের পিছন পিছন যেতে যেতে বলল, "তারপর মনে কর পুলিশ—"

"পুলিশের কী হইছে ওস্তাদ?"

"যদি ধরে?"

"সেইটা তো আমাগো চিন্তা না। পুলিশরে তো আগে থেকে রেডি কইরা রাখা হইছে। ওগো টাকা পয়সা দিছি—ওরা আমাগো ধরব ক্যান?"

"মাজহার—তোরে একটা জিনিস বলি। সব জিনিস টাকা পয়সা দিয়া হয় না। এই পুলিশের মাঝেও ভালো পুলিশ আছে—তাগো হাতে যদি ধরা পড়ি তখন টাকা পয়সা দিয়া ছুটবার পারবি না। তখন জন্মের মতো শেষ।"

মাজহার তার ময়লা দাঁত বের করে হাসল। বলল, "হেইডা নিয়া আপনার চিন্তা করনের কিছু নাই। তারা আমাগো ধরব না। হেইডা বড় বড় ওস্তাদের দায়িত্ব। আমরা ধরা খাইলে তারা কি আর ছুইটা যাইব? তারাও ধরা খাইব।"

কাদের ড্রাইভার তার সিগারেটে টান দিয়ে বলল, "চায়ের তিয়াশ হইছে।"

"সামনে লাকী রেস্টুরেন্ট। ফাস্ট ক্লাশ চা বানায়।" মাজহার জিজ্ঞেস করল, "থামবেন?"

"আয় থামি।"

কিছুক্ষণের ভেতরে তারা লাকি রেস্টুরেন্টের সামনে পৌঁছে গেল। এই রেস্টুরেন্টটা তৈরি হয়েছে ট্রাক ড্রাইভারদের জন্য। বেশ কয়েকটা ট্রাক সামনে ইতস্তত দাঁড়িয়ে আছে। কাদের ড্রাইভার একটা ট্রাকের পিছনে তার ট্রাকটা পার্ক করল। তারপর ট্রাক থেকে নেমে ট্রাকটার চারিদিকে ঘুরে এল। তারপর মাজহারকে বলল, "আয়। চা খাই।"

"আমি কী ট্রাক পাহারা দিমু?"

"এই ট্রাক পাহারা দিয়ে কী করবি। পোলাপান ঘুমায়—চব্বিশ ঘণ্টার আগে এরা উঠব না।"

"ঠিক আছে।"

তারপর দুইজন হাঁটতে হাঁটতে লাকি রেস্টুরেন্টে চা খেতে গেল।

ঠিক তখন ট্রাকের ভেতরে সবগুলো বাচ্চা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। জালাল বলল, "এখন বাইর হতি হবে। দেরি করা যাবে না।"

একজন ভয় পাওয়া গলায় বলল, "বাইর হইয়া কই যামু?"

জালাল তেরপল থেকে মাথা বের করে চারপাশে দেখল, তারপর বলল, "সামনে চায়ের দোকান—ঐ দিকে যাওয়া যাবি না। রাস্তা পার হয়া পিছন দিকে যাবি—ঐখানে গাছের পিছনে লুকাবি। কেউ যেন না দেখে। প্রথম কে বের হবি?"

কেউ একজন বলল, "আমি।"

"ঠিক আছে। বের হ–"

দেখা গেল বের হওয়া খুব সোজা না। তেরপলটা টেনে বের হওয়ার জন্যে যেটুকু জায়গা করা হয়েছে সেই জায়গাটা খুব বেশি না—খানিকটা গিয়ে ছেলেটা আটকে গিয়ে যন্ত্রণার মতো শব্দ করতে থাকে।

জালাল বলল, "আস্তে! চিল্লাইস না—" তারপর উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে নামানোর চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত ছেলেটা ছোট ফুটো দিয়ে বের হয়ে ধুপ করে নিচে পড়ল। পেটের ছাল ওঠে গিয়েছে কিন্তু সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার সময় নাই।

জালাল জিজ্ঞেস করল, "কেউ দেখে নাই তো?"

"না।"

"তুই একটু খাড়া—ছোট একটারে নামাই।"

তারপর ছোট একজনকে উপর থেকে ধরে আস্তে আস্তে নিচে নামাল। ট্রাকটা অনেক উঁচু কাজেই একসময় ছেড়ে দিতে হলো এবং বাচ্চাটা ধুপ করে নিচে পড়ল। জালাল শুনতে পেল নিচে পড়ে বাচ্চাটা যন্ত্রণার একটা শব্দ করল—সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না—চাপা স্বরে বলল, "পালা।"

দুইজন তখন রাস্তা পার হয়ে অন্যদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর একজন একজন করে বের হতে থাকে, বের হওয়ার সাথে সাথেই না চলে গিয়ে একজন পরের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে—তাকে টেনে নামাতে সাহায্য করে। বের হওয়ার গর্তটা ছোট তাই মাঝে মাঝেই একজন দুইজন সেখানে আটকে যাচ্ছিল তখন অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ভেতর থেকে চা খেয়ে যখন ট্রাক ড্রাইভাররা তাদের ট্রাকে ফিরে আসছিল তখনো তারা বের হচ্ছিল না। অন্য ট্রাক ড্রাইভারদের বিশ্বাস করা যাবে কিনা তারা বুঝতে পারছিল না—তাই কোনো ঝুঁকি নিল না।

যখন সবাই বের হয়ে গেছে শুধু জালাল বাকি ঠিক তখন দেখা গেল কাদের ড্রাইভার আর মাজহার চা খেয়ে লাকি রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে আসছে। ট্রাকের পাশে এই মাত্র বের হয়ে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল সে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "ড্রাইভার আসছে।"

জালাল বলল, "পালা।"

মেয়েটা দ্রুত পালিয়ে গেল কিন্তু জালাল বের হতে পারল না, ট্রাকের মাঝে আটকা পড়ে গেল।

কাদের ড্রাইভার আর মাজহার দুইজনে মিলে পুরো ট্রাকটা আবার ঘুরে দেখে। তেরপলের যে অংশে একটু জায়গা করে সবাই বের হয়েছে সেখানে এসে কাদের ড্রাইভার আর মাজহার দাঁড়িয়ে গেল। কাদের ড্রাইভার বলল, "এইখানে ফাঁকা কেন?"

মাজহার বলল, "মনে হয় ঠিক করে বান্ধি নাই।" সে একটু উঁকি দিয়ে দেখল, তারপর তেরপলটা টেনে বের হওয়ার জন্যে যে জায়গাটা ফাঁক করা হয়েছিল সেটা বন্ধ করে দিল। ভেতরে বসে থেকে জালালের মনে হলো সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদে।

কাদের ড্রাইভার আর মাজহার ট্রাকে ওঠে। জালাল শুনতে পেল ইঞ্জিনটা স্টার্ট হয়েছে, ট্রাকটা একটা ঝাঁকুনি দিল তারপর আস্তে আস্তে নড়তে শুরু করে। হঠাৎ করে জালাল বুঝতে পারল সে যদি এখনই ট্রাক থেকে বের হতে না পারে তাহলে আর কোনোদিন বের হতে পারবে না।

জালাল লাফিয়ে ওঠে দাঁড়াল, বের হওয়ার যে অংশটুকুতে তেরপলটা টেনে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে জালাল সেখানে হাত ঢুকিয়ে ধাক্কা দিয়ে বের হবার রাস্তা করার চেষ্টা করতে থাকে। প্রথমে মনে হয় সে বুঝি পারবে না, কিন্তু শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা দেবার পর একটুখানি তেরপল সরে যায়—জালাল চলন্ত ট্রাক থেকে নিচের রাস্তাটা দেখতে পেল। দেখতে দেখতে ট্রাকের বেগ বাড়তে থাকে—কিছুক্ষণের মাঝে ট্রাকটা এতো জোরে যেতে থাকবে যে বের হওয়ার রাস্তা থাকলেও সে আর বের হতে পারবে না।

জালাল আর দেরি না করে ফাঁকা অংশটি দিয়ে তার শরীর বের করে দেয়, ঘাড় আর মাথা আটকে গিয়েছিল ধাক্কা দিয়ে সেটি ছুটিয়ে নিতে চেষ্টা করে, শেষ পর্যন্ত ছুটিয়ে এনে সে বের হয়ে আসে, কোনোমতে সে তেরপলটা ধরে ঝুলে থাকে। শরীরের নিচ দিয়ে রাস্তাটা ছুটে যাচ্ছে, হাতটা ছাড়লেই সে রাস্তায় পড়বে এবং সাথে সাথে ট্রাকের পিছনের চাকা তাকে পিষে ফেলবে। কাজেই তাকে শুধু নিচে রাস্তায় পড়লেই হবে না ছিটকে ট্রাকের নিচ থেকে সরে আসতে হবে যেন ট্রাকের চাকা তাকে পিষে ফেলতে না পারে।

জালাল বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নিল তারপর একটা ঝটকা দিয়ে লাফ দিল, চেষ্টা করল রাস্তায় পড়ার সাথে সাথে গড়িয়ে সরে যেতে। প্রচণ্ড জোরে সে রাস্তার মাঝে আছাড় খেয়ে পড়ে, মাথার এক আঙুল কাছ দিয়ে ট্রাকের চাকাগুলো পার হয়ে গেল, তার মাঝে জালাল গড়াতে গড়াতে রাস্তার কিনারে একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে থামল। জালালের মনে হলো সে নিশ্চয়ই মরে

গেছে। কয়েক সেকেন্ড পর বুঝতে পারল সে মরেনি, তখন মনে হলো সে নিশ্চয়ই মরে যাবে। আরো কয়েক সেকেন্ড পরে দেখল সে মরে নি এবং তখন প্রথমবার তার মনে হতে লাগল সে হয়তো এবারে বেঁচে যাবে। জালাল মোটামুটি নিশ্চিত ছিল যে তার হাত—পা নিশ্চয়ই ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে গেছে। সে সাবধানে তার হাত নাড়ল, পা নাড়ল এবং তখন সে বুঝতে পারল অনেক ব্যথা পেলেও আসলে তার হাত—পা ভাঙে নি শুধু শরীরের ছাল চামড়া ওঠে গেছে।

ঠিক তখন সে অনেকগুলি ছোট ছোট পায়ের শব্দ শুনতে পেল এবং দেখতে দেখতে সবগুলো বাচ্চা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। কে একজন তার উপর ঝুঁকে পড়ে ভাঙ্গা গলায় ডাকল, "জালাল, এই জালাল—"

জালাল গলার স্বর শুনে চিনতে পারল, জেবা তাকে ডাকছে।

কে একজন হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল, "মরে গেছে—মরে গেছে—"

জেবাও এবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, "জালাল—এই জালাইল্যা তুই মরিস না—আল্লাহ্‌র কসম লাগে।"

জালাল ওঠে বসার চেষ্টা করে বলল, "মরি নাই। আমি মরি নাই।"

"মরে নাই—মরে নাই—" সবাই মিলে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "জালাল মরে নাই।"

জালাল ফিস ফিস করে বলল, "তোরা রাস্তার উপর থাকিস না, লুকায়া থাক। একটা বাস ট্রাক আইলে সবাইরে দেইখা ফালাইব।"

ঠিক তখন অনেক দূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল, সাথে সাথে সবাই দৌড়ে রাস্তার পাশে ঢালু জায়গায় লুকিয়ে যায়। জালালও গড়িয়ে গাছটার পিছনে সরে যায়। জেবা তখনো তার হাত ধরে রেখেছে।

কয়েকটা গাড়ি চলে যাবার পর জালাল জেবার হাত ধরে ওঠে দাঁড়াল তারপর খুড়িয়ে খুড়িয়ে রাস্তা থেকে নিচে নেমে আসে, অন্য সবাই তখন সেখানে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে। হঠাৎ করে সবার মন ভালো হয়ে গেছে, ফিসফিস করে নিজেদের ভেতর কথা বলছে, খিক খিক করে হাসছে, হাসতে হাসতে একজন আরেকজনকে ধাক্কা দিচ্ছ, ধাক্কা দিয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছে। এরা চব্বিশ ঘন্টা আগেও কেউ কাউকে চিনত না, এখন এরা সবাই একে অন্যের প্রাণের বন্ধু।

জালাল খুড়িয়ে খুড়িয়ে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আমাগো মনে হয় এইখানে থাকন ঠিক না।"

জেবা জানতে চাইল, "ক্যান?"

"হেরা যখন দেখব ট্রাকের ভেতরে কেউ নাই তখন আমাগো খুঁজতে আসব না?"

জালালের বয়সী একটা ছেলে বলল, "আইতে দাও। আমি যদি কল্লাটা না ছিড়ি।"

সবাই হই হই করে উঠল, "কল্লা ছিড়া ফালামু। কল্লা ছিড়া ফালামু।"

কারো ভেতরে কোনো ভয়ডর নেই এবং তাদেরকে দেখে জালালের ভেতরের ভয় ডরও আস্তে আস্তে উঠে যেতে শুরু করল।

কাদের ড্রাইভার তার ট্রাকটাকে রাস্তার পাশে দাঁড়া করাল। অন্ধকারে একজন মানুষ দাঁড়িয়েছিল সে তার টর্চ লাইটটা কয়েকবার জ্বালাল আর নিভাল। তারপর ট্রাকটার দিকে এড়িয়ে এল।

কাদের ড্রাইভার ট্রাকের জানালা দিয়ে মাথা বের করে বলল, "ভাইয়ের নাম কী?"

"মিজান।"

"মিজান বকশ?"

"হ্যাঁ।"

"উঠেন।"

মাজহার দরজা খুলে একটু সরে মিজান বকশকে বসার জায়গা করে দিল। মিজান বকশ মাজহারের পাশে বসে বলল, "চলেন। আমাদের বস মাল ডেলিভারি নেবার জন্য বসে আছেন।"

কাদের ড্রাইভার তার ট্রাক স্টার্ট করল, মিজান বকশ বলল, "সামনে বামে মোড় নিবেন।"

কাদের ড্রাইভার সামনে গিয়ে বাম দিকে একটা ছোট রাস্তায় ঢুকে পড়ল। ছোট রাস্তা তাই কাদের ড্রাইভার সাবধানে তার ট্রাকটি চালিয়ে নেয়। মিজান বকশ কখনো ডানে কখনো বামে যেতে বলতে থাকে এবং মিনিট পনেরো পর একটা অন্ধকার বাড়ির সামনে থামল। বাইরে বড় গেট, কোনো একজন গেটটা খুলে দিল কাদের ড্রাইভার তখন ট্রাকটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে আসে।

ইঞ্জিনের স্টার্ট বন্ধ করতেই ট্রাকের হেডলাইট নিভে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। তখন একজন মানুষ ট্রাকটার দিকে এগিয়ে আসে। কাদের ড্রাইভার ট্রাক থেকে নেমে, মানুষটির দিকে এগিয়ে যায়—অন্ধকারে

তার চেহারা ভালো দেখা যায় না। খসখসে গলায় মানুষটি বলল, "রাস্তায় কোনো অসুবিধা হয় নাই তো?"

"জে না।"

"গুড। কয়জন আনছেন।"

"বিশ জন।"

"আধমরা দুর্বল রোগী আনেন নাই তো?"

কাদের ড্রাইভার মাথা নাড়ল, "জে না। পোলাপাইন সবগুলাই মোটামুটি তেজী।"

মানুষটি মাথা নাড়ল, বলল, "গুড।" তারপর মাজহারের দিকে তাকিয়ে বলল, "খোল দেখি তেরপলটা। পোলাপানগুলারে দেখি।"

মাজহার দড়ির বাধন খুলে তেরপলটা টেনে সরিয়ে দিল। খসখসে গলার স্বরের মানুষটা তার টর্চ লাইটটা ট্রাকের ভেতর ফেলল। ভেতরে কেউ নেই—একেবারে ফাঁকা। মানুষটা তার টর্চলাইটটা বন্ধ করে থমথমে গলায় বলল, "ভেতরে কেউ নাই।"

কাদের ড্রাইভার আর মাজহার ইলেকট্রিক শর্ট খাওয়ার মতো চমকে উঠল। বলল, "নাই?"

"না।"

তারা মানুষটার কথা বিশ্বাস না করে নিজেরা ট্রাকেরে ভেতর তাকাল, সত্যিই ভেতরটা ফাঁকা। পুরোপুরি ফাঁকা। কাদের ড্রাইভার হা করে তাকিয়ে থাকে, তার নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না। বিশটা বাচ্চাকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে এখানে শুইয়ে রাখা হয়েছিল—আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে তাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠার কথা না! একজনও নেই! কাদের ড্রাইভার আমতা আমতা করে বলল, "কই গেল ওরা?"

"প্রশ্নটার উত্তর আপনিই দেন। কই গেল?"

মাজহার ট্রাকটার আরো কাছে গিয়ে চটটাকে টেনে একটু নাড়াচাড়া করল, তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো চটটা একটু টানাটানি করলে তার নিচে লুকিয়ে থাকা বাচ্চাগুলো বের হয়ে আসবে।

খসখসে গলার মানুষটা একটু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এর অর্থটা কী বুঝেছেন ড্রাইভার সাহেব?"

"কী?"

"এর অর্থ এর মাঝে পুলিশ র‍্যাব বর্ডার গার্ড সব জায়গায় খবর চলে গেছে। এর অর্থ পুলিশ র‍্যাব বর্ডার গার্ড আপনাকে আর আপনার বসকে

খুঁজতে শুরু করেছে। আপনাদের মতো কাঁচা কাজ যারা করে তারা ধরা পড়ে জেলখানার ভাত খেলে আমার কিছু বলার নাই। কিন্তু আপনাদের কাঁচা কাজের জন্যে আমার সমস্যা হলে আমার খুব মেজাজ খারাপ হয়।"

কাদের ড্রাইভার বলল, "কিন্তু কিন্তু—"

খসখসে গলায় মানুষটার গলা আরও খসখসে হয়ে গেল। বলল, "আমি মানুষটা হাসিখুশি—আমার সহজে মেজাজ খারাপ হয় না। আজকে মেজাজ খারাপ হলো। শেষবার যখন আমার মেজাজ খারাপ হয়েছিল তখন এক ডজন লাশ পড়ছিল। এইবার তার থেকে বেশি পড়তে পারে—"

কাদের ড্রাইভার আবার কথা বলার চেষ্টা করল কিন্তু তার গলা থেকে কোনো শব্দ বের হলো না। ফ্যাকাসে মুখে দেখল খসখসে গলার স্বরের মানুষটা হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

ইভা ঘুমানোর আগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কিছু একটা পড়ে। এটা তার বহুদিনের অভ্যাস। আজকেও সে একটা বই পড়ছিল, নতুন একজন লেখকের উপন্যাস, পড়া শেষ করে শুয়ে পড়বে করতে করতেই বেশ রাত হয়ে গেল। যখন প্রায় জোর করে বইটা বন্ধ করে বালিশে মাথা রাখল ঠিক তখন তার টেলিফোনটা বেজে উঠল।

এতো রাতে কে ফোন করতে পারে ভেবে সে টেলিফোনটা টেনে নেয়, অপরিচিত একটা নম্বর। ফোনটা ধরবে কী ধরবে না ভাবতে ভাবতে সে টেলিফোনটা ধরল, "হ্যালো।"

"দুই টেকী আপা?"

ইভা চমকে উঠল—তাকে দুই টেকী আপা ডাকে স্টেশনের বাচ্চারা। এতো রাতে স্টেশনের একটা বাচ্চা তাকে কেন ফোন করবে? ইভা বিছানায় সোজা হয়ে বসল, বলল, "তুমি কে?"

"আপা, আমি জালাল।"

"জালাল? তুমি এতো রাতে?"

"আপা, আমাদের অনেক বড় বিপদ হইছে।"

"কী বিপদ?"

"আপা ছেলেধরা আমাগো বিশজনকে ধইরা ইন্ডিয়া পাঠাইতে লাগছিল—"

ইভা চমকে উঠল, "কী বলছ তুমি?"

"সত্যি বলছি আপা। আমরা অনেক কষ্ট কইরা পালাইয়া আইছি।"

ইভা বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে বলল, "থ্যাংক গড। এখন তোমরা কোথায়?"

"সবাই একটা খেতের মাঝে লুকাইয়া আছি—আমি একটা দুকান থাইকা আপনেরে ফোন করতে আসছি।"

"তোমরা পুলিশের কাছে যাও না কেন? থানাটা খুঁজে বের করে এক্ষুণি পুলিশের কাছে যাও।"

জালাল টেলিফোনের অন্যপাশে চুপ করে রইল। ইভা বলল, "কী হলো?"

"আপা—"

"বল।"

"পুলিশের কাছে গিয়া আমাগো কোনো লাভ নাই। আমাগো কেউ বিশ্বাস করে না। দূর দূর কইরা দৌড়াইয়া দেয়। আর ছেলেধরার লগে পুলিশের মনে হয় খাতির আছে। আমাগো যদি আবার ছেলেধরার কাছে ফেরত দেয়?"

"কী বলছ তুমি?"

"সত্যি কথা কইতাছি আপা। আমরা গরিব মানুষ, রাস্তার পোলাপান—আমাগো কোনো কথা কেউ বিশ্বাস করে না। মনে করেন এই যে ফোন করতাছি—"

"হ্যাঁ, কী হয়েছে ফোনের?"

"কেউ আমাগো একটা ফোন পর্যন্ত করতে দেয় না। দূর দূর কইরা দৌড়ায়া দেয়। অনেক কষ্ট কইরা ফোন করতাছি—"

"ঠিক আছে জালাল, তোমরা এখন কোথায়?"

"জানি না আপা। মনে লয় বর্ডারের কাছে।"

"তুমি যার ফোন থেকে কল করেছ তাকে দাও দেখি—"

"দেই আপা।"

ইভা তখন সেই মানুষটার সাথে কথা বলল, জায়গাটা কোথায় সেটা কোন থানায় পড়েছে এই বিষয়গুলো জেনে নিল। তারপর আবার জালালের সাথে কথা বলল। জালালকে বলল, "তোমার কোনো চিন্তা নেই। তোমরা যেখানে আছ সেখানে ঘাপটি মেরে বসে থাক। আমি সব ব্যবস্থা করছি।"

"কী ব্যবস্থা করবেন আপা?"

"পুলিশ র‍্যাব যেটা দরকার সেটা পাঠাব।"

"আমাগো কুনো সমিস্যা হবি না তো?"

"না। তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না। এমনিতে তোমরা ভালো আছো তো?"

জালাল বলল, "জে আপা।"

"কেউ ব্যথা পায় নাই তো?"

"আমি একটু পাইছি।"

"সর্বনাশ! কেমন করে—"

"ট্রাক থেকে লাফ দিছিলাম—একটুর জন্যে ট্রাকের নিচে পড়েছিলাম।"

ইভা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। বাচ্চা পাচারকারীর হাতে ধরা পড়ল কেমন করে, ছাড়াই বা পেল কেমন করে কে জানে। সে এখন আর সেটা জানতে চাইল না, জালালকে বলল, "তুমি অন্যদের সাথে গিয়ে বস। আমি ব্যবস্থা করছি।"

ঠিক আছে আপা। তারপরে লাইন কেটে গেল।

জালাল যখন হেঁটে হেঁটে অন্য সবার কাছে ফিরে যাচ্ছে ইভা তখন টেলিফোনে নানা মানুষের সাথে কথা বলতে শুরু করেছে।

ইভার যোগাযোগ খুব ভালো, ভোর হওয়ার আগেই জালাল আর সব বাচ্চা কাচ্চাকে উদ্ধার করা হলো, কাদের ড্রাইভার আর মাজহার সহ ট্রাকটাকে আটক করা হলো। তারা খুব অবাক না হলেও জরিনি খালা আর মস্তাজ মিয়াকে যখন ধরা হলো তারা একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। পরদিন পত্রিকায় বিশটি বাচ্চা এবং পিছনে হাতকড়া লাগানো অবস্থায় জরিনি খালা, মস্তাজ মিয়া, কাদের ড্রাইভার আর মাজহারের ছবি ছাপা হলো। বাচ্চারা সবাই খবরের কাগজে ছাপা হওয়া সেই ছবিটা দেখেছিল, টেলিভিশনে তাদের যে সাক্ষাৎকারটা প্রচারিত হয়েছিল সেটা অবশ্যি তারা কেউ দেখতে পায়নি। তারা দেখার জন্যে টেলিভিশন কোথায় পাবে?

১৩.

মায়া ছলছল চোখে ইভাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি বিষ্যুৎবার কইরা আর আইবা না আফা?"

ইভা জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করল, তারপর বলল, "না, মায়া। আমি বিষ্যুৎবার করে আর আসব না। আমাকে ঢাকাতে ট্রান্সফার করেছে।"

জেবা ক্ষুব্ধ মুখে বলল, "কিসের লাগি ট্রান্সফার করল? তুমি এইখানে চাকরি করলেই তো ভালা আছিল।"

ইভা বলল, "সারাজীবন তো এক জায়গায় থাকা যায় না—নতুন জায়গায় যেতে হয়।"

মায়া কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "তুমি আর আইবা না? কুনোদিন আইবা না?"

ইভা সত্যি কথাটি বলতে পারল না—একটু ইতস্তত করে বলল, "আসব। মাঝে মাঝে আসব। যখন আসব তখন তোমাদের সাথে দেখা হবে।"

জেবা জিজ্ঞেস করল, "সত্যি সত্যি আসবা তো?"

ইভা বলল, "আসব।" তারপর মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "জালাল কই?"

"আছে।"

কিছুক্ষণের মাঝে জালালকে দেখা গেল। হাতে এক বান্ডিল খবরের কাগজ নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আসছে। ইভা জিজ্ঞেস করল, "কী খবর জালাল? তোমার শরীর কেমন?"

"আগের থাইকা ভালা। বেদনা কমছে।"

"গুড।" ইভা জালালের মাথায় হাত দিয়ে বলল, "ভাগ্যিস তুমি ছিলে, তা না হলে কী হতো?"

জালাল কোনো কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ইভা বলল, "তুমি তো শুনেছ জালাল আমি ঢাকায় ট্রান্সফার হয়েছি। বৃহস্পতিবার করে আর আসা হবে না।"

জালাল মাথা নাড়ল। ইভা বলল, "আমি তোমাদের খুব মিস করব।"

কেউ কোনো কথা বলল না শুধু মায়া একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল। তার চোখে পানি টল টল করছে। ইভা নরম গলায় বলল, "তোমরা সবাই মিলেমিশে থেকো। একজন আরেকজনকে দেখে রেখো।"

সবাই মাথা নাড়ল। ইভা তখন জালালের দিকে তাকিয়ে বলল, "জালাল, তুমি সবাইকে দেখে রেখো।"

জালাল নিচু গলায় বলল, "রাখমু আপা।"

"দেখবে কারো যেন কোনো বিপদ না হয়।"

"দেখমু আপা।"

"তুমি একজন খুব অসাধারণ ছেলে জালাল। এতোটুকু ছোট ছেলে হয়ে তুমি এতোগুলো ছেলেমেয়েকে এতোবড় বিপদ থেকে রক্ষা করেছ– এটা অবিশ্বাস্য।"

জালাল কোনো কথা বলল না, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ইভা বলল, "আমি তোমাদের জন্যে ছোট কয়েকটা গিফট এনেছিলাম। ছেলেদের জন্যে টি শার্ট, মেয়েদের জন্যে ফ্রক। তোমাদের দিয়ে যাই, ভাগাভাগি করে নিও।"

জেবা বলল, "জালালের কাছে দেন, হে ভাগ কইরা দিব।"

ইভা বলল, "ঠিক আছে। আমি জালালকে দিচ্ছি।" বলে ইভা তার স্যুটকেস খুলে সেখান থেকে বড় একটা প্যাকেট বের করে জালালের হাতে দিল। অন্য যে কোনো সময় হলে প্যাকেটের ভেতর কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যেত, আজকে কেউ কাড়াকাড়ি করল না।

এরকম সময় বহুদূরে ট্রেনের হুইসিল শোনা গেল, কিছুক্ষণ পরেই ট্রেনটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মায়া নিচু গলায় বলল, "টেরেন আহে।"

অন্যদিনের মতো সবাই ছোটাছুটি শুরু করল না, ইভাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। ট্রেনটা বিশাল একটা জন্তুর মতো ফোঁসফাঁস করতে করতে তাদের সামনে এসে থামে। প্যাসেঞ্জাররা ট্রেন থেকে নামতে থাকে, আজকে তারা কেউ তাদের ব্যাগ নেবার জন্যে কিংবা ভিক্ষা নেবার জন্যে ছোটাছুটি শুরু করল না।

প্যাসেঞ্জাররা নামার পর ইভা বলল, "এবার তাহলে আমি আসি?"

মায়া তার ফ্রকটা উপরে তুলে তার চোখ মুছে, ফ্রকটা তোলার জন্যে তার ছোট পেটটা দেখা যেতে থাকে। জালাল তার হাতের খবরের কাগজ আর ইভার দেওয়া টি-শার্ট আর ফ্রকের প্যাকেটটা জেবার হাতে দিয়ে ইভাকে বলল, "আপা, আপনার ব্যাগটা টেরেনে তুইলা দিই।"

"তোমার তোলার দরকার কী? হালকা ব্যাগ—আমি তুলতে পারব।"

"হেইটা জানি। কিন্তুক আমি তুইলা দিবার চাই।"

"ঠিক আছে। তাহলে দাও।"

জালাল তখন ইভার ব্যাগটা নিয়ে ট্রেনে তুলে দিল। ইভা জালালের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "থ্যাংকু জালাল।"

"আমাগো জন্যে দোয়া কইরেন আপা।"

"করব। সব সময় করি।"

জালাল চলে যেতে যেতে আবার ফিরে এসে বলল, "আপা, আপনেরে একটা কথা বলি?"

"বল।"

"আমি আর ভুয়া মিনারেল ওয়াটার বেঁচি না।"

"ভেরি গুড।"

"আর বেচমু না।"

ইভা একটু হেসে তার মাথায় আবার হাত বুলিয়ে দিল।

ট্রেনটা যখন ছেড়ে দেয় ইভা তখন জানালা দিয়ে মাথা বের করে তাকাল। সবগুলো বাচ্চা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। ট্রেনটা যখন চলতে শুরু করে তখন সবগুলো বাচ্চা ট্রেনের সাথে সাথে ছুটতে থাকে।

ট্রেনটা ছুটছে, বাচ্চাগুলোও ছুটছে। ট্রেনের গতি বাড়ছে বাচ্চাগুলোও আরো জোরে ছুটছে। আরো জোরে ছুটছে।

তারা কতোক্ষণ এইভাবে ছুটবে?

শেষ কথা

আমার ছেলেমেয়ে তখন খুব ছোট, বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব গোলমাল। শহীন জননী জাহানারা ইমামের নামে মেয়েদের হলটির নামকরণ করা হয়েছে সে জন্যে দেশদ্রোহী যুদ্ধাপরাধীরা নানাভাবে আমাদের হুমকি দিচ্ছে—একদিন বাসায় বোমা পর্যন্ত মারল। তখন মনে হলো ছেলেমেয়েদের আর আমাদের সাথে রাখা ঠিক হবে না। আমরা তখন তাদের ঢাকায় রেখে এলাম। একটা বাসায় তারা একা একা থাকে, বৃহস্পতিবার বিকেলে ট্রেনে ঢাকা যাই, ছুটির দুটি দিন তাদের সাথে কাটিয়ে শনিবার রাতে রওনা দিয়ে পরদিন ভোরে ফিরে আসি।

প্রতি বৃহস্পতিবার স্টেশনে যেতে হয়, তখন স্টেশনের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে প্রথমে আমার এক ধরনের পরিচয় হলো তারপর তাদের সাথে আমার এক ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। এই বইটি আমার সেই বন্ধুদের নিয়ে লেখা। বইয়ের শেষ এডভেঞ্চারটি কাল্পনিক, এছাড়া অন্য ছোটখাট যেসব ঘটনার কথা লিখেছি তার বেশিরভাগ আমার চোখে দেখা।

প্রথম যে শিশুটির সাথে পরিচয় হয়েছিল তার নাম জালাল। তার কাছ থেকে একটা খবরের কাগজ কিনে আমি তাকে দুটো টাকা বেশি দিয়েছিলাম, সে টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে আমাকে রীতিমতো ধমক দিয়ে বলেছিল, "বেশি দিচ্ছেন কেন? আমি কি ভিক্ষা করছি?"

রাতের ট্রেনে একদিন ঢাকা আসব। প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখি ছোট ছোট বাচ্চাদের বিশাল বাহিনী এগিয়ে আসছে। সবার সামনে বাহিনীর নেতা, ছোট একটি ছেলে তার দুই হাত পিছনে। কাছে এসে বলল, "স্যার আপনার জন্যে একটা উপহার।" তারপর পিছনে ধরে রাখা জিনিসটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। একটা চিপসের প্যাকেট। আমার জীবনে কতো উপহার,

কতো পুরস্কার পেয়েছি—কিন্তু সেই চিপসের প্যাকেটটি এখনো আমার জীবনে পাওয়া সবচেয়ে বড় উপহার!

যাদের নিয়ে লিখেছি তারা কোনোদিন এই বইটি পড়বে না। সত্যি কথা বলতে কী তারা কোনোদিন জানতেও পারবে না আমি তাদের নিয়ে একটি বই লিখেছি।

এই ব্যাপারটাতে এক ধরনের কষ্ট আছে মনে হয় সেই কষ্টটা থেকে আমার মুক্তি নেই।

জন্ম ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশন্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠারো বছর পর দেশে ফিরে এসে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।

স্ত্রী প্রফেসর ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

আলোকচিত্র ▪ [illegible]